তাওহীদের ডাক

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১০

সাক্ষাৎকার :

মুহতারাম আমীরে জামা'আত

- বিশুদ্ধ আক্বীদা : গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা
- দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের ভূমিকা
- শিরক ও আজকের সমাজ
- আহলেহাদীছের পরিচয়
- বিশ্বে প্রচলিত ধর্মসমূহ
- বাংলাদেশে ইসলাম

Contents

The Call to Tawheed

তাওহীদের ডাক

৩য় সংখ্যা

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১০

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন

নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন: ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল: ০১৭৩৭৪৩৮২৩৪
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com

মূল্য : ১৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ নির্দেশিকা** ৩
- **আক্বীদা**
  - বিশুদ্ধ আক্বীদা : গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা ॥ মুযাফফর বিন মুহসিন ৫
- **তারবিয়াত**
  - আত্মশুদ্ধি ॥ মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম ৮
- **তানযীম**
  - দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের ভূমিকা ॥ ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ১১
- **তাজদীদে মিল্লাত**
  - শিরক ও আজকের সমাজ ॥ ইমামুদ্দীন ১৪
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন**
  - আহলেহাদীছের পরিচয় ॥ ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১৭
- **মনীষীদের লেখনী থেকে**
  - আহলেহাদীছ আন্দোলন ও উহার বৈশিষ্ট্য ॥ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী ২০
- **বিশেষ নিবন্ধ**
  - ১৯৮৫ সালের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ ২২
- **সাক্ষাৎকার**
  - মুহতারাম আমীরে জামা'আত ২৫
- **সাময়িক প্রসঙ্গ**
  - অস্থির পাকিস্তান : কালো মেঘের ঘনঘটা ॥ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক ২৮
- **দেশে দেশে ইসলাম**
  - বাংলাদেশে ইসলাম : প্রাচীন ও মধ্যযুগ ॥ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ৩৪
- **ধর্ম ও সমাজ**
  - বিশ্বে প্রচলিত ধর্মসমূহ : একটি পরিসংখ্যান ॥ হোসাইন আল-মাহমূদ ৪০
- **গ্রন্থ পর্যালোচনা**
  - 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান': একজন কম্যুনিস্টের মহৎ নিরীক্ষণ ॥ আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ৪২
- **শিক্ষাঙ্গন**
  - আরবী অভিধানচর্চা : সূচনা ও বিকাশ ॥ নূরুল ইসলাম ৪৫
  - Islam on trade and commerce ॥ MJ Mohammed Iqbal ৪৭
- **আলোকপাত** ৪৯
- **সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব** ৫১
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৫২
- **কবিতা** ৫৩
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৪
- **কুইজ/শব্দজট** ৫৬

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম

‘সংস্কৃতি’ একটি জাতির জন্য দর্পণ স্বরূপ, যাতে জাতির পরিচয় প্রতিবিম্বিত হয়। এজন্য সংস্কৃতিকে জাতির প্রাণ বললে অত্যুক্তি হয় না। বর্তমান বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি মানবজাতির জন্য আশির্বাদের তুলনায় বহুগুণ অভিশাপে পরিণত হয়েছে। মানবীয় মূল্যবোধভিত্তিক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে তা আজ সমাজজীবনকে কলুষিত করে তুলেছে। বিশেষতঃ যুবসমাজ এর প্রভাবে যে ভয়াবহ হারে নৈতিকতা বিবর্জিত চরিত্রহীন শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে, তাতে মানব সভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। এরূপ ধ্বংসাত্মক পরিবেশে তরুণদের মাঝে ইসলামের চিরন্তন ও বিশুদ্ধ আদর্শ প্রচার ও সে আদর্শের আলোকে তাদের মাধ্যমে সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণ এবং জাতিকে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে মুক্ত রাখার মহান লক্ষ্যেই ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর মুখপত্র **‘তাওহীদের ডাক’**-এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল আজ থেকে ২৫ বছর পূর্বে ১৯৮৫-এর ফেব্রুয়ারীতে। কিন্তু ষড়যন্ত্রের কারণে সরকারী নিবন্ধন না পাওয়ায় তা পরে বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় ১৯৯৬-এর ফেব্রুয়ারীতে একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অতঃপর চৌদ্দ বছরের মাথায় বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ফালিল্লা-হিল হামদ। উল্লেখ্য যে, মাঝে মে ১৯৯২-তে ‘যুবসংঘ বার্তা’ এবং নভেম্বর ১৯৯৩ সালে ‘আল-ইত্তেহাদ’ নামে দু’টি পত্রিকাও প্রকাশ করা হয়েছিল।

‘তাওহীদ’ অর্থ একত্ব। নিজ সত্তা ও গুণাবলীতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁকেই একমাত্র উপাস্য হিসাবে মেনে নেওয়ার নাম তাওহীদ। যুগে যুগে পৃথিবীতে আগত সকল নবী-রাসূলের দায়িত্ব ছিল এই তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। শেষনবীর পর উম্মতে মুহাম্মাদী হিসাবে এই গুরু দায়িত্ব এখন আমাদের। তাই উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অংশ হিসাবে নব আঙ্গিকে **‘তাওহীদের ডাক’**-এর শুভযাত্রা শুরু হল।

যারা আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের সম্মুখে নিজের জ্ঞানকে সমর্পণ করবে এবং অহি-র সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে মেনে নিবে, ইহকালের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেবে, সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী চলতে দৃঢ়চিত্ত হবে **‘তাওহীদের ডাক’** হবে তাদেরই মুখপত্র। **‘তাওহীদের ডাক’**-এর পথ চলার শুরুতে মহান আল্লাহ্র নিকটে আমাদের একান্ত প্রার্থনা, তিনি যেন এর যাত্রাপথকে নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক রাখেন, এর দিকে তাঁর বান্দাদের অন্তরসমূহকে ঝুঁকিয়ে দেন এবং আমাদেরকে তাওহীদী সমাজ গঠনের তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের এ শুভক্ষণে আমরা আমাদের সকল লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী ভাই-বোনকে আন্তরিক সালাম ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং সকলের নিকটে দো‘আ চাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

ইলম (জ্ঞান)

আল-কুরআনুল কারীম :

١-أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ،

'যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের ভীতিশঙ্কা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত কামনা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না। বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে যারা বুদ্ধিমান' *(যুমার ৯)*।

٢-وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ،

'মানুষ, জন্তু ও চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে বহু বর্ণ রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মাঝে প্রকৃত জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল' *(ফাতির ২৮)*।

٣- يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ،

'তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা জ্ঞানবান' *(বাক্বারা ২৭৯)*।

٤-قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ،

'তোমরা মান্য কর অথবা অমান্য কর, যারা পূর্ব থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, যখন তাদের কাছে এর তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে' *(বনী ইসরাঈল ১০৭)*।

٥-هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ،

'তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত, যদিও তারা ছিল ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট' *(জুম'আ ২)*।

٦-أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ،

'যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ? তারাই বোঝে যারা বোধশক্তিসম্পন্ন' *(রা'দ ১৯)*।

٧- يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ،

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উঁচু করে দিবেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা খবর রাখেন' *(মুজাদালাহ ১১)*।

হাদীছে নববী থেকে :

١-إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، *(مسلم: ٤٣١٠ عن أبي هريرة)*-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল (ও ছওয়াব) বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি আমল ব্যতীত (যেগুলোর ছওয়াব বন্ধ হয় না) : (১) ছাদাকায়ে জারিয়া, (২) ইলম যার দ্বারা (লোকের) উপকার সাধিত হয় এবং (৩) সুসন্তান, যে তার (পিতা-মাতা) জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।

٢- فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ ، وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ ، (عن حذيفة)

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জ্ঞানের মর্যাদা আমার নিকট ইবাদতের চেয়ে বেশী। তোমাদের দ্বীনের সর্বোত্তম দিক হলো তোমাদের আল্লাহভীতি' *(হাকেম, ত্বাবারানী, বাযযার, ছহীহুল জামে' হা/ ৪৩১৪)* ।

٣- مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وإنما أنا قاسم والله يعطي، (البخاري: ٧١، ومسلم، ١٠٣٧ عن معاوية)-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান দান করেন। আর আমি নিছক বণ্টনকারী। মূলতঃ দান করেন আল্লাহই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০)*।

٤- مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ،

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দিবেন। তাদের সম্মানে ফেরেশতারা নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেয় এবং তাদের জন্য যমীন ও আসমানের সকল কিছু এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। একজন ইবাদতকারীর উপর জ্ঞানীর মর্যাদার তুলনা হল সমস্ত তারকারাজির উপর চাঁদের মর্যাদার তুলনা। জ্ঞানীরা হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে দীনার বা দিরহাম (অর্থ-সম্পদ) রেখে যান না বরং তারা জ্ঞানকে রেখে যান। যে তা গ্রহণ করলো সে যেন পূর্ণ অংশই পেল' *(আবুদাঊদ, তিরমীযী, ইবনে মাজাহ, সনদ ছহীহ)* ।

٥-وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، (مسلم: ٢٦٩٩ عن ابي هريرة)-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখনই কোন দল আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তেলাওয়াত করে এবং ঐ বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করে তখনই তাদের উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) শান্তি অবতীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহর রহমত তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে। ফেরেশতারাও তাদেরকে ঘিরে রাখেন এবং আল্লাহ তাদের কথা তার ফেরেশতাদের নিকট উল্লেখ করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)*।

٦- خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، (البخاري: ٥٠٢٧ عن عثمان)-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১০৯)*।

বিদ্বানদের কথা

- লোকমান (আঃ) তার সন্তানকে বলেন, হে বৎস! তুমি এ জন্য জ্ঞানার্জন করো না যে তুমি জ্ঞানীদের সাথে অহংকার করবে কিংবা মূর্খদের উপর নিজেকে জাহির করবে অথবা বিভিন্ন মজলিসে নিজেকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করবে। তুমি জ্ঞানকে উদাসীনতায় পরিত্যাগ করো না বা মূর্খতার মাঝে নিক্ষেপ করো না। হে বৎস! তুমি আপন চোখ দিয়ে দ্বীনী মজলিস বাছাই করে নাও। যখন কোন দলকে আল্লাহর স্মরণ করতে দেখবে তখন তাদের সাথে যোগ দিবে। তুমি যদি আলোচ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখ তাহলেও তা তোমার জ্ঞানবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। আর যদি তা তোমার অজানা থাকে তবে তোমার নতুন কিছু জানা হবে। হতে পারে আল্লাহ তাদের উপর রহমত নাযিল করবেন যার একটি অংশ তুমিও প্রাপ্ত হবে। আর যে দল আল্লাহকে স্মরণ করে না তাদের সাথে বসবে না। কেননা যদি আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে তোমার জ্ঞান থাকে তাহলে তা তোমাকে কোন ফায়দা দেবে না। পক্ষান্তরে যদি তা তোমার অজানা থাকে তাহলে তারা তোমাকে পথভ্রষ্ট ও অক্ষম করে ফেলবে। হতে পারে আল্লাহ তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন যা তোমাকেও স্পর্শ করবে *(আহমাদ হা/১৬৫১, দারেমী হা/৩৭৭, সনদ হাসান)*।

- আলী (রাঃ) বলেন, জ্ঞান অর্থ-সম্পদের চেয়ে উত্তম। কেননা জ্ঞান তোমাকেই পাহারা দেয় কিন্তু অর্থকে পাহারা দিতে হয়। অথচ জ্ঞান হলো শাসক, আর অর্থ হলো শাসিত। অর্থ ব্যয় করলে নিঃশেষ হয়ে যায় কিন্তু জ্ঞান বিতরণ করলে আরো বৃদ্ধি পায় *(গায্যালী, ইহয়াউল উলূম, ১/১৭-১৮)*।

- মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, তোমরা জ্ঞানার্জন কর। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জনের অর্থ তাঁকে ভয় করা। জ্ঞানের আকাংখা করা ইবাদত। জ্ঞান চর্চা করা হলো তাসবীহ। জ্ঞানের অনুসন্ধান করা জিহাদ। অজ্ঞ ব্যক্তিকে জ্ঞান দেওয়া ছাদাকা। উপযুক্ত ক্ষেত্রে তা ব্যয় করা আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের কারণ। আর তা হালাল-হারাম জানার মানদণ্ড, একাকিত্বের বন্ধু, নিঃসঙ্গতার সঙ্গী, সুখ-দুঃখের ধ্রুবক, চরিত্রের সৌন্দর্য, অপরিচিতের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যম। আল্লাহ জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে এমন মর্যাদাবান করেন যা স্থায়ীভাবে তাকে অনুসরণীয় করে রাখে *(আল-আজুরী, আখলাকুল ওলামা, পৃঃ ৩৪-৩৫)*।

- আবু দারদা (রাঃ) বলেন, জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উপার্জিত হয় যেমন ধৈর্য ধৈর্যধারণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যে ব্যক্তি কল্যাণের খোঁজে ব্যতিব্যস্ত হয় সে কল্যাণ লাভ করে। যে অকল্যাণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে সে অকল্যাণ থেকে রক্ষা পায় *(কিতাবুল ইলম, ইবনে খায়ছামাহ, পৃঃ ২৮)*।

- তিনি বলেন, কোন মানুষ জ্ঞানী হয়ে জন্ম নেয় না। তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হয় *(কিতাবুল ইলম, ইবনে খায়ছামাহ, পৃঃ ২৮)*।

- হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, অজ্ঞ আমলকারী পথহারা পথিকের ন্যায়। সে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী করে। অতএব তুমি জ্ঞানার্জন কর এমনভাবে যাতে তা ইবাদতকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে, আবার ইবাদত কর এমনভাবে যেন তা জ্ঞানার্জনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। একদল লোক এমনভাবে ইবাদতে ডুবে থাকে যে তারা জ্ঞানার্জনের সুযোগ পায় না, অথচ তারা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর তরবারী চালিয়ে দেয়। যদি জ্ঞান থাকত তাহলে তারা এরূপ কর্মে লিপ্ত হতে পারত না।

- মুজাহিদ বিন জুবায়ের বলেন, লজ্জা ও ভয় হলো জ্ঞানার্জনের প্রতিবন্ধকতা *(ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী, ১/২২৮ পৃঃ)*।

- ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ) বলেন, ইলম হলো সংরক্ষিত সম্পদ, আর এই সম্পদ ভাণ্ডারটির চাবী হলো প্রশ্ন।

- ইয়াহইয়া বিন খালেদ বলেন, তুমি অল্প হলেও জ্ঞানের প্রতিটি শাখাকে আয়ত্ব করো। কারণ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ মানুষকে উচ্চকিত করে। আর যে বিষয়টি তোমার নিকট অজ্ঞাত তা তোমার জন্য শত্রুস্বরূপ। জ্ঞানের মাধ্যমেই তুমি তার হাত থেকে নিরাপদ হতে পার।

- মাসরুক (রহঃ) বলেন, একজন ব্যক্তির জ্ঞানী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে আল্লাহকে ভয় করে আর মূর্খ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে নিজের জ্ঞান নিয়ে চমৎকৃত হয়।

- আওন বিন আব্দুল্লাহ বলেন, তোমার যদি জ্ঞানী হওয়ার সাধ্য থাকে জ্ঞানী হও, যদি সাধ্য না থাকে তাহলেও জ্ঞানান্বেষী হও। যদি জ্ঞানান্বেষী হওয়ার সাধ্যও না থাকে তবে জ্ঞানীদের প্রতি ভালবাসা রাখ, তাও যদি না পার কমপক্ষে তাদেরকে ঘৃণা করো না।

- ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, তুমি যখন কোন বিষয় জানবে, তোমার চেহারায় তার চিহ্ন, প্রভাব, প্রশান্তি, মর্যাদা ও ধৈর্যশীলতা ফুটে উঠবে। জ্ঞানীরা কখনো বাচালের মত কথা বলেন না, মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে যারা একমাসের কথা এক ঘণ্টায় বলে *(ইবনুল হাজ, আল-মাদখাল, ২/১২৪)*।

- মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল (রহঃ) বলেন, বহু মূর্খ ব্যক্তি রয়েছে যার কাছে জ্ঞান উপস্থিত হয়েছে কিন্তু সে তা দূরে নিক্ষেপ করেছে। বহু দুনিয়াত্যাগী আমলকারী রয়েছে যে জাহেলিয়াতের আমল করে তার আমলগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। মানুষের সর্বপ্রথম বের হওয়া জিনিসটি হলো তার জিহবা (কথা বলা) আর জ্ঞান থেকে বের হওয়া প্রথম জিনিসটি হল ধৈর্য *(শু'আবুল ঈমান ৭/৪২৮)*।

- ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, খাদ্য, পানীয়ের চেয়ে জ্ঞানের গুরুত্ব অধিক। কেননা খাদ্য দিনে একবার বা দু'বার প্রয়োজন হয়। কিন্তু জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে প্রতিটি নিঃশ্বাসের সমপরিমাণে *(মাদারিজুস সালেকীন ২/৪৭০)*।

- সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, যে বিষয় আমি জেনেছি তা যদি আমল করি তবেই আমি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী, আর যদি প্রাপ্ত জ্ঞান অনুযায়ী আমল না করি তবে দুনিয়ার বুকে আমার চেয়ে অজ্ঞ আর কেউ নেই।

- ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মুনাফিক জ্ঞানের পরিচয় দেয় মুখে আর মু'মিনের জ্ঞানবত্তা প্রকাশ হয় তার আমলের মাধ্যমে।

- জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, জ্ঞান হলো আমলের দাস। আর আমল হলো জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যদি আমলের প্রয়োজন না থাকত তবে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন হত না। যদি জ্ঞান না থাকত তবে আমলেরও প্রয়োজন হত না। তাই সত্য জানার পর তা পরিত্যাগকারীর চেয়ে সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি অধিক উত্তম।

- ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যদি জ্ঞানের অধিকারীগণ জ্ঞানকে সংরক্ষণ করতেন এবং যথার্থ স্থানে তাকে রাখতেন তবে তাঁরা দুনিয়াবাসীর উপর জয়লাভ করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তাঁরা জ্ঞানকে দুনিয়াদারদের কাছে সমর্পণ করেছেন দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের অভিপ্রায়ে। ফলে তাঁরা অপদস্ত হয়েছেন।

সারবস্তু

১. আল্লাহকে জানা ও তাঁর ইবাদত করার মাধ্যম হলো জ্ঞান।
২. বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সঠিক আমলের মাধ্যম জ্ঞান।
৩. জ্ঞানার্জন একটি ইবাদত ।
৪. জ্ঞানই আল্লাহভীতির উপাদান।
৫. জ্ঞান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দান।
৬. জ্ঞান দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি।
৭. জ্ঞান সত্য-মিথ্যা ও কল্যাণ-অকল্যাণের একমাত্র মানদণ্ড।
৮. যে জ্ঞান আল্লাহর স্মরণ বহির্ভূত তা প্রকৃত জ্ঞান নয়।
৯. মানবকল্যাণের সর্বোত্তম মাধ্যম জ্ঞান। কেননা জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে সত্য ও কল্যাণের আলোয় উদ্ভাসিত করা যায়।
১০. জ্ঞান বিতরণ ছাদাকায়ে জারিয়া, যার পুরস্কার অন্তহীন।
১১. জ্ঞান মানুষকে নবীগণের (আঃ) পরই স্থান দেয়।
১২. জ্ঞান চূড়ান্ত সফলতা তথা জান্নাত লাভের কারণ।

বিশুদ্ধ আক্বীদা : গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা

মুযাফফর বিন মুহসিন

বিশ্বাস বা দর্শন মানবজীবনের এমন একটি বিষয় যা তার জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। এটা এমন এক ভিত্তি যাকে অবলম্বন করেই মানুষ তার সমগ্র জীবনধারা পরিচালনা করে। এই যে মৌলিক জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে দুনিয়ার বুকে মানুষ আবর্তিত হচ্ছে, যে আদর্শ ও বিশ্বাসকে লালন করে তার সমগ্র জীবন পরিচালিত হচ্ছে তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'আক্বীদা' শব্দ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। কোন অবকাঠামো যেমন ভিত্তি ছাড়া অকল্পনীয়, তেমনভাবে একজন মুসলিমের জীবনে আক্বীদা ও বিশ্বাসের দর্শন এমনই একটি অপরিহার্য বিষয় যা ব্যতীত সে নিজেকে মুসলিম হিসাবে সম্বোধিত হওয়ার অধিকার ও দাবী হারিয়ে ফেলে। এটা এমন এক অতুলনীয় শক্তির আঁধার যা একজন মুসলমানকে তার আদর্শের প্রতি শতভাগ আস্থাবান করে তুলে এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে বিরামহীনভাবে সচেষ্ট রাখে। অপরপক্ষে মানবজগতের যাবতীয় পথভ্রষ্টতার মূলে রয়েছে এই মৌলিক আক্বীদা থেকে বিচ্যুত হওয়া। এজন্য একজন মুসলমানের জন্য আক্বীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখা এবং সে বিশ্বাসের যথার্থতা নিশ্চিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা ব্যতীত কোন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে মুসলিম হতে পারে না। প্রতিটি কথা ও কর্ম যদি বিশুদ্ধ আক্বীদা ও বিশ্বাস থেকে নির্গত না হয় তবে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয়ে অবিশ্বাস রাখে তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে' *(মায়েদা ৫)*। তিনি আরো বলেন, '(হে নবী!) তোমাকে এবং এবং তোমার পূর্বসূরিদের আমি প্রত্যাদেশ করেছি যে, যদি তুমি আমার শরীক স্থাপন কর তবে তোমার যাবতীয় শ্রম বিফলে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৬৫)*। মানুষ যুগে যুগে পথভ্রষ্ট হয়েছে মূলতঃ আক্বীদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ঘটার কারণে। এজন্য বিষয়টি সূক্ষ্মতা ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে জানা অপরিহার্য। নিম্নে ইসলামী আক্বীদার পরিচিতি ও মানব জীবনে বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণের গুরুত্ব আলোচনা করা হল।

আক্বীদার সংজ্ঞা :

শাব্দিক অর্থ : আক্বীদা শব্দটি আরবী العقد শব্দমূল থেকে উদ্গত, যার আভিধানিক অর্থ হল সম্পর্ক স্থাপন করা বা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, অথবা কোন কিছুকে সাব্যস্ত করা বা শক্তিশালী হওয়া। অতএব মানুষ যার সাথে নিজের অন্তরের সুদৃঢ় যোগাযোগ স্থাপন করে তাকেই আক্বীদা বলা যায়।

পারিভাষিক অর্থ : সাধারণভাবে সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অকাট্য কর্মধারাকে আক্বীদা বলা হয় যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির মনে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আর ইসলামী আক্বীদা বলতে বুঝায়- আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর যিনি সৃষ্টিকর্তা সেই মহান প্রভুর প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর উলূহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত ও গুণবাচক নামসমূহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, নবী-রাসূলগণ, তাঁদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহ, তাক্বদীরের ভাল-মন্দ এবং বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা প্রমাণিত দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ ও অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কিত সংবাদসমূহ ইত্যাদি যে সব বিষয়াদির উপর সালাফে ছালেহীন ঐক্যমত পোষণ করেছেন তার প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখা। আল্লাহর নাযিলকৃত যাবতীয় আহকাম-নির্দেশনার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রচারিত শরী'আতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ নিশ্চিত করা ইসলামী আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত *(ড. নাছের বিন আব্দুল করীম আল-আক্বল, মাবাহিসুন ফি আক্বীদায়ে আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, পৃঃ ৩)*।

আক্বীদা এবং শরী'আত দু'টি পৃথক বিষয়। কেননা শরী'আত হল দ্বীনের কর্মগত রূপ এবং আক্বীদা হলো দ্বীনের জ্ঞানগত রূপ যার প্রতি একজন মুসলমানের আন্তরিক বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।

আক্বীদা শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহার :

আক্বীদা শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় আরো কয়েকটি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন- তাওহীদ, সুন্নাত, উছূলুদ্দীন, ফিকহুল আকবার, শরী'আত, ঈমান ইত্যাদি। যদিও আক্বীদা শব্দটি এগুলোর তুলনায় সামগ্রিক একটি শব্দ। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ব্যতীত অন্যান্য ফেরকা এক্ষেত্রে আরো কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহার করে। যেমন-

যুক্তিবিদ্যা (ইলমুল কালাম) : মু'তাযিলা, আশ'আরিয়া এবং তাদের অনুসারীগণ এই পরিভাষাটি ব্যবহার করে। এটা সালাফে ছালেহীনের নীতি বিরোধী অনর্থক কর্ম, যার সাথে শরী'আতের সম্পর্ক নেই।

দর্শন : দার্শনিকগণ এই পরিভাষা ব্যবহার করে। তবে আক্বীদাকে দর্শন শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। কেননা দর্শনের ভিত্তি হল অনুমান, বুদ্ধিবৃত্তিক কল্পনা ও অজ্ঞাত বিষয়াদি সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টি, যার সাথে ইসলামী আক্বীদার সম্পর্ক নেই।

তাসাওউফ : কোন কোন দার্শনিক, প্রাচ্যবিদ ও ছূফীবাদীরা আক্বীদাকে ছুফিতত্ত্ব হিসাবে ব্যাখ্যা দেয়। এটাও অগ্রহণযোগ্য। কেননা সুফিতত্ত্বও নিরর্থক কল্পনা ও কুসংস্কারের উপর নির্ভরশীল। এর অতীন্দ্রিয় ও কাল্পনিক ভাবমালার সাথে শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই।

ধর্মতত্ত্ব (Theology): এটাও দার্শনিক, প্রাচ্যবিদ, যুক্তিবাদীদের আবিস্কৃত শব্দ। এর দ্বারাও ইসলামী আক্বীদার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কেননা এর উদ্দেশ্য কেবল স্রষ্টা সম্পর্কে দার্শনিক, যুক্তিবাদী এবং নাস্তিকদের ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করা।

অধিবিদ্যা : দার্শনিক ও পশ্চিমা লেখকরা একে Metaphisycs নামে অভিহিত করে। এটি অনেকটা ধর্মতত্ত্বের কাছাকাছি পরিভাষা।

সাধারণভাবে ধর্ম সম্পর্কিত বা ধর্মহীন বিভিন্ন বাতিল চিন্তাধারাকেও আক্বীদা বলা যায়। যেমন - ইহুদীবাদ, বৌদ্ধবাদ, হিন্দুবাদ, খৃষ্টবাদ, নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ আক্বীদা বনাম ভ্রষ্ট আক্বীদা :

বিশুদ্ধ আক্বীদা বলতে বুঝান হয় ইসলামী আক্বীদা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাকে যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্দেশিত ও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রচারিত অর্থাৎ যা পূর্ণাঙ্গভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সমর্থিত এবং সালাফে ছালেহীনের ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত।

এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় আক্বীদা ও বিশ্বাস মিশ্রিত, কাল্পনিক, কুসংস্কারযুক্ত এবং মিথ্যার উপর ভিত্তিশীল। যা নিশ্চিতভাবে মানবজাতির গন্তব্যপথকে ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়।

আক্বীদার মৌলিক বিষয়বস্তু :

আক্বীদার মৌলিক বিষয়বস্তু ছয়টি। যথা:-

১.আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেকে যেভাবে মানবজগতের কাছে উপস্থাপন করেছেন ঠিক সেভাবে তা সত্তাগতভাবে, গুণগতভাবে এবং কর্মগতভাবে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা।

২.ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস : তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেরূপ বর্ণনা এসেছে ঠিক সেভাবে বিশ্বাস করা।

৩.রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস : তাঁদের নবুওয়াত ও তাদের চারিত্রিক পবিত্রতার উপর নির্দ্বিধায় বিশ্বাস স্থাপন করা।

৪.আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস : মূল চারটি কিতাব তথা যাবুর, ইঞ্জীল, তাওরাত ও কুরআনসহ নাযিলকৃত অন্যান্য ছোট ছোট কিতাব ও ছহীফাসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

৫. শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস : অর্থাৎ মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদসমূহ যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন, তার প্রতি বিশ্বাস রাখা।

৬.তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস : অর্থাৎ যা কিছু দুনিয়ার বুকে ঘটছে তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞাতসারেই ঘটছে এবং তিনি সৃষ্টিজগত তৈরীর বহু পূর্বেই ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন- এই বিশ্বাস জাগ্রত জ্ঞান সহকারে পোষণ করা।

আলোচিত ছয়টি বিষয়ের প্রতি পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা একজন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বহু দলীল দ্বারা এগুলো প্রমাণিত *(বাকারা ১৭৭, ২৮৫; নিসা ১৩৬; ক্বামার ৪৯; ফুরকান ২; মিশকাত হা/২ 'ঈমান অধ্যায়')*।

আক্বীদা ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য :

আক্বীদা শব্দটি প্রায়ই ঈমান ও তাওহীদের সাথে গুলিয়ে যায়। অস্বচ্ছ ধারণার ফলশ্রুতিতে অনেকেই বলে ফেলেন, আক্বীদা আবার কি? আক্বীদা বিশুদ্ধ করারই বা প্রয়োজন কেন? ঈমান থাকলেই যথেষ্ট। ফলশ্রুতিতে দ্বীন সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে এক বড় ধরনের অপূর্ণতা সৃষ্টি হয়, যা প্রায়ই মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেয়। এজন্য ঈমান ও আক্বীদার মধ্যকার সম্পর্ক ও পার্থক্য স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে বিষয়টি উপস্থাপন করা হল:-

প্রথমত : ঈমান সমগ্র দ্বীনকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর আক্বীদা দ্বীনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

দ্বিতীয়ত : আক্বীদার তুলনায় ঈমান আরো ব্যাপক পরিভাষা। আক্বীদা হল কতিপয় ভিত্তিমূলক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। অন্যদিকে ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম নয়; বরং মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার বাস্তব প্রতিফলনকে অপরিহার্য করে দেয়। সুতরাং ঈমানের দু'টি অংশ। একটি হল অন্তরে স্বচ্ছ আক্বীদা পোষণ। আরেকটি হল বাহ্যিক তৎপরতায় তার প্রকাশ। এ দু'টি পরস্পরের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত যে কোন একটির অনুপস্থিতি ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়।

তৃতীয়ত : আক্বীদা হল বিশ্বাসের মাথা এবং ঈমান হল শরীর। অর্থাৎ আক্বীদা হল ঈমানের মূলভিত্তি। আক্বীদা ব্যতীত ঈমানের উপস্থিতি তেমনি অসম্ভব, যেমনভাবে ভিত্তি ব্যতীত কাঠামো কল্পনা করা অসম্ভব। সুতরাং ঈমান হল বাহ্যিক কাঠামো আর আক্বীদা হল ঈমানের আভ্যন্তরীণ ভিত্তি।

চতুর্থত : আক্বীদার দৃঢ়তা যত বৃদ্ধি পায় ঈমানও তত বৃদ্ধি পায় ও মজবুত হয়। আক্বীদায় দুর্বলতা সৃষ্টি হলে ঈমানেরও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, আমলের ক্ষেত্রেও সে দুর্বলতার প্রকাশ পায়। যেমনভাবে রাসূল (ছা:) বলেন, মানুষের হৃদয়ের মধ্যে একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে, যদি তা পরিশুদ্ধ হয় তবে সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ থাকে, যদি তা কদর্যপূর্ণ হয় তবে সমস্ত শরীরই কদর্যপূর্ণ হয়ে যায়। *(মুত্তাফাক আলাইহে, মিশকাত 'ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়' হা/২৭৬০)*

পঞ্চমত : বিশুদ্ধ আক্বীদা বিশুদ্ধ ঈমানের মাপকাঠি, যা বাহ্যিক আমলকেও বিশুদ্ধ করে দেয়। যখন আক্বীদায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় তখন ঈমানও বিভ্রান্তিপূর্ণ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের অনুসরণ করা হয় এজন্য যে, তারা যে আক্বীদার অনুসারী ছিলেন তা ছিল বিশুদ্ধ এবং কুরআন ও সুন্নাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এজন্যই তারা ছিলেন খালিছ ঈমানের অধিকারী এবং পৃথিবীর বুকে উত্থিত সর্বোত্তম জাতি। অন্যদিকে মুরজিয়া, খারেজী, কাদরিয়াসহ বিভিন্ন উপদলসমূহ আক্বীদার বিভ্রান্তির কারণে তাদের ঈমান যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তেমনি তাদের কর্মকাণ্ড নীতিবিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এভাবেই আক্বীদার অবস্থান পরিবর্তনের কারণে ঈমানের অবস্থানও পরিবর্তন হয়ে যায়।

ষষ্ঠত : সকল রাসূলের মূল দা'ওয়াত ছিল বিশুদ্ধ আক্বীদা তথা তাওহীদের প্রতি আহবান জানানো। এক্ষেত্রে কারো অবস্থান ভিন্ন ছিল না। কিন্তু আমল-আহকাম সমূহ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি আমলসমূহ পূর্ববর্তী নবীদের যুগে ছিল না অথবা থাকলেও তার বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্নরূপ। সুতরাং ঈমানের দাবীসূচক আমলসমূহ কালের বিবর্তনে পরিবর্তিত হলেও আক্বীদার বিষয়টি সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে অভিন্ন ও অপরিবর্তনীয়।

সঠিক আক্বীদা পোষণের অপরিহার্যতা :

১.সঠিক আক্বীদা পোষণ করা ইসলামের যাবতীয় কর্তব্যসমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় কর্তব্য। রাসূল (ছা:) বলেন, 'আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দেয়' *(মুত্তাফাক আলাইহে, 'ঈমান' অধ্যায়, হা/১২)*।

২.ঈমান সাধারণভাবে সমস্ত দ্বীনে ইসলামকেই অন্তর্ভূক্ত করে। আর আক্বীদা দ্বীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয় তথা অন্তরের অবিমিশ্র স্বীকৃতি ও আমলে তা যথার্থ বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করে।

৩.আক্বীদার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ তথা শিরক এমন ধ্বংসাত্মক যে পাপী তওবা না করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরককারীকে ক্ষমা করবেন না। এ ব্যতীত যে কোন পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন' *(নিসা ১১৬)*।

৪.আক্বীদা সঠিক থাকলে কোন পাপী ব্যক্তি জাহান্নামে গেলেও চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে না। ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি জীবনে কোনদিন সৎ আমল না করায় তার পুত্রদের নির্দেশ দেয় তাকে পুড়িয়ে দিয়ে ছাইভস্ম যমীনে ও পানিতে ছড়িয়ে দিতে এই ভয়ে যে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দান করবেন। তার ধারণা ছিল এর মাধ্যমে সে আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। অতঃপর আল্লাহ ছাইভস্মগুলো একত্রিত করে তাতে রূহ প্রদান করলেন এবং তাকে তার এই কাজের হেতু জানতে চাইলেন। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, যেহেতু সে আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখে *(বুখারী, হা/৩২৯৪ 'কিতাবুল আম্বিয়া', বাব ন. ৫২)*। অন্য হাদীছে এসেছে, যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট থাকবে তাকেও শেষ পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে *(মুত্তাফাক আলাইহে, মিশকাত হা/৫৫৭৯,'কিয়ামতের অবস্থাসমূহ ও সৃষ্টির পুনরুত্থান' অধ্যায়, 'হাউযে কাওছার ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ*। অর্থাৎ সঠিক

আক্বীদার কারণে একজন সর্বোচ্চ পাপী ব্যক্তিও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামে অবস্থানের পর জান্নাতে প্রবেশ করতে সমর্থ হবে।

৫.আক্বীদা সঠিক না থাকলে সৎ আমলকারীকেও জাহান্নামে যেতে হবে। যেমন একজন মুনাফিক বাহ্যিকভাবে ঈমান ও সৎ আমল করার পরও অন্তরে কুফরী পোষণের কারণে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে *(নিসা ১৪৫)*। একই কারণে একজন কাফির সারা জীবন ভাল আমল করা সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন সে তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। কেননা তার বিশ্বাস ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ। আল্লাহ বলেন, 'সেদিন আমি তাদের কৃতকর্মের দিকে মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় রূপান্তরিত করব' *(ফুরকান ২৩)*।

৬.কবরের জীবনে আক্বীদা সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ তোমার রব কে? তোমার নবী কে? তোমার দ্বীন কি? সেদিন আমল সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হবে না। এখান থেকেই দুনিয়া ও আখিরাতে আক্বীদার গুরুত্ব অনুভব করা যায়।

৭.ইসলামের কালেমা অর্থাৎ 'কালেমা তাওহীদ' উচ্চারণ করা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে তখনই যখন তা সঠিক বিশ্বাস প্রসূত হয়। নতুবা তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ হল- ক. কালেমা তাওহীদের অর্থ জানা। খ. খুলূছিয়াতের সাথে উচ্চারণ করা। গ. সত্যায়ন করা। ঘ. অন্তরে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা। ঙ. কালেমা ও কালেমার অনুসারীদের প্রতি মুহাব্বত পোষণ করা। চ. আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাবীসমূহ পরিপূর্ণ আনুগত্য ও নিষ্ঠার সাথে পালন করা। ছ. কালেমার বিপরীত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা। এ বিষয়গুলো প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। যা স্পষ্টতঃই নির্দেশ করে যে, বিশ্বাসের সঠিকতা ইসলামে প্রবেশের মূল শর্ত। অর্থাৎ কালেমায়ে তাওহীদ যদি সঠিক বিশ্বাসের সাথে উচ্চারিত না হয় তবে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে সকল আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

৮. ইসলামের একটি মৌলিক নীতি হল 'ওয়ালা' ও 'বারা' অর্থাৎ 'আল্লাহর জন্য সম্পর্ক স্থাপন এবং আল্লাহর জন্যই সম্পর্কচ্ছেদ' যা আক্বীদার সাথে সংশ্লিষ্ট। একজন কাফির, মুনাফিক, মুশরিকের প্রতি আমরা যে বিমুখতা দেখাই তার কারণ হল তার কুফরী এবং বিভ্রান্ত আক্বীদা। ঠিক যেমনভাবে একজন মুমিনকে আমরা শর্তহীনভাবে ভালবাসি তার ঈমান ও বিশুদ্ধ আক্বীদার কারণে। এ কারণে একজন মুসলমান পাপাচারী হলেও তার আক্বীদার কারণে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন এক ব্যক্তিকে মদ্যপানের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে বেত্রাঘাত করা হচ্ছিল। তখন একজন ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তোমার উপর লা'নত করুন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, 'এই মদ্যপায়ীকে লা'নত কর না, কেননা সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসে' *(মুসনাদে বায্যার হা/২৬৯, ছনদ ছহীহ, দ্রঃ বুখারী হা/৬৭৮০)*।

৯.সমকালীন মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে আক্বীদার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। তাদের মাঝে যেমন বহু লোক কবর পূজায় ব্যস্ত, তেমনি লিপ্ত হরহামেশা তাওহীদ বিরোধী ও শিরকী কার্যকলাপে। কেউবা ব্যস্ত নিত্য-নতুন 'মাহদী', 'মাসীহ' আবিষ্কারের প্রচেষ্টায়। মূর্তিপূজার স্থলে এখন আবির্ভাব হয়েছে শহীদ মিনার, স্তম্ভ, ভাস্কর্য, অগ্নিশিখা, প্রতিকৃতি ইত্যাদি শিরকী প্রতিমূর্তি। এগুলো সবই সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে অজ্ঞতার দুর্ভাগ্যজনক ফলশ্রুতি। অন্যদিকে আক্বীদায় দুর্বলতা থাকার কারণে মুসলিম পণ্ডিতদের চিন্তাধারা ও লেখনীর মাঝে শারঈ' সূত্রগুলোর উপর নিজেদের জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা এবং বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার নামে কুফরী বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি যুক্তিবাদী ও শৈথিল্যবাদী ধ্যান-ধারণার জন্মও নিচ্ছে যার স্থায়ী প্রভাব পড়ছে পাঠকদের উপর। এভাবেই আক্বীদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব আমাদের পথভ্রষ্ট করে ফেলছে প্রতিনিয়ত।

১০. বিভ্রান্ত মতাদর্শের অনুসারী মুনাফিক, বিদ'আতী এবং ভিন্ন ধর্মানুসারী ইহুদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিক ও নাস্তিক্যবাদীরা তাদের আক্বীদা প্রচার ও প্রসারে বিভিন্নমুখী যে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রতিরোধ করা ও তা থেকে আত্মরক্ষা করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক কর্তব্য। এজন্য সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতেই হবে। অন্যথায় আপাতঃ দর্শনীয় পশ্চিমা বস্তুবাদী চিন্তাধারার জোয়ার আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে মোটেও সময় নিবে না।

আক্বীদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির ভয়াবহ ফলাফল :

আলেম-ওলামাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল মৌলিক আক্বীদাসমূহের বিষয়ে সাধারণ মুসলমানদের সঠিক জ্ঞান দান করা এবং সাধ্যমত সর্বত্র তার প্রসার ঘটান। কেননা যে ব্যক্তি তার জীবনের ব্যষ্টিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সর্বক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রতিফলন ঘটাতে পারে, সে দুনিয়া ও আখিরাত সর্বক্ষেত্রে সফল। অথচ দুঃখজনক হল, আধুনিক যুগে বহু আলেমই আক্বীদাকে খুব সংকীর্ণ অর্থে ধরে নিয়েছেন, যার প্রভাব অবধারিতভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে পড়ছে। ফলে আমলগত ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আক্বীদার উপস্থিতিকে নিশ্চিত না করে অনেকে কেবল আক্বীদা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা রাখাই যথেষ্ট মনে করেছে যেমনটি করেছিল মু'তাযিলাসহ আরো কিছু উপদল। অনেকে আবার কেবল অন্যদের সাথে নিজেদের পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে, কিংবা রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মত উপলক্ষের সাথে আক্বীদাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে যেমন-খারেজীরা। ফলশ্রুতিতে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রে বিধর্মীগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের পথ ধরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি নিত্য-নতুন শিরকী মতবাদ সহজেই মুসলমানদের মাঝে গেড়ে বসতে সক্ষম হয়েছে। সচেতনতার দাবীদার বহু মুসলমান এ ধারণা রাখে যে, ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মের লোকেরাও জান্নাতে যাবে যদি তারা সৎ হয়। 'আক্বীদা ও শরী'আত ভিন্ন জিনিস, আক্বীদা কেবলমাত্র একটি সাংস্কৃতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা; ব্যবহারিক জীবনে যার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই, ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়; রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা ইত্যাদি সার্বজনীন ক্ষেত্রে তার কোন ভূমিকা থাকা উচিৎ নয়' ইত্যাদি কুফরী চিন্তাধারা লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে অধিকাংশ মুসলমানের মানসজগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত ধোঁয়াশার প্রভাব এতই ক্ষতিকারক যে মানুষের সত্যানুসন্ধিৎসু মনকে একেবারেই পঙ্গু করে রাখে এবং মিথ্যার আধিপত্যকে মেনে নেওয়ার শৈথিল্যবাদী মানসিকতা প্রস্তুত করে দেয়। আর এসবই সঠিক আক্বীদা থেকে বিচ্যুতির অবধারিত ফলশ্রুতি।

সংক্ষিপ্ত আলোচনার শেষ প্রান্তে বলা যায় যে, আক্বীদা দ্বীনের প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়। আক্বীদা সঠিক হওয়ার উপরই ঈমান ও আমলের যথার্থতা নির্ভরশীল। তাই সবকিছুর পূর্বে আক্বীদার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করাই একজন মুসলিমের প্রথম ও অপরিহার্য দায়িত্ব। আজকের পৃথিবীতে যখন সংঘাত হয়ে উঠেছে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক তখন একজন মুসলমানের জন্য স্বীয় আক্বীদা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক বেড়েছে। কেননা হাযারো মাযহাব-মতাদর্শের দ্বিধা-সংকটের ধ্বংসাত্মক, দুর্বিষহ জঞ্জালকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে সত্যের দিশা পাওয়া এবং সত্য ও স্বচ্ছ দ্বীনের দিকে ফিরে আসা বিশুদ্ধ আক্বীদা অবলম্বন ব্যতীত অসম্ভব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল মুসলিম ভাই-বোনকে সঠিক আক্বীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছ ঈমানের উপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন ও যাবতীয় শিরকী ও জাহেলী চিন্তাধারা থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!!

আত্মশুদ্ধি

মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে তিনটি বিশেষ উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো হল জ্ঞান, দেহ এবং আত্মা। জ্ঞানকে দিকনির্দেশনা দেয় ঈমান, দেহের কল্যাণ সাধন করে ইসলাম এবং আত্মার পরিশুদ্ধি নিশ্চিত করে ইহসান। একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠা এ উপাদানগুলোর সুষম সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক কঠিন ও আয়াসসাধ্য বিষয় হলো ইহসান। আত্মার পবিত্রতা অর্জনের সাথেই ইহসান সম্পৃক্ত।

আত্মার স্বরূপ নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এতটুকুই বলেছেন যে, এটি মহান আল্লাহ্‌র একটি হুকুম। স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এই তাৎপর্যময় হুকুমের পবিত্রতা রক্ষা করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনই মানুষকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারে। এজন্য ব্যক্তির মাঝে 'তাযকিয়াতুন নফস' বা আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি সাধন করা ইসলামের মৌলিক লক্ষ্য। ইসলামের সকল নিয়মতান্ত্রিক ইবাদতসমূহ একই লক্ষ্যে নিবেদিত। বলা যায় আত্মশুদ্ধিতার উপরই নির্ভর করে মানুষের যাবতীয় কার্যক্রম ও তার ফলাফল।

মূলতঃ মানুষের অন্তর্জগত এমন একটি বিশাল জগত যার ব্যাপকতা দৃশ্যমান জগতের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আবার এটি এমন এক স্থান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যেখানে অন্য কারোরই প্রবেশাধিকার নেই। মানুষ তার প্রতিটি কাজ কি উদ্দেশ্যে করছে তার খবর কেবল তার আত্মাই জানে। আবার সমস্ত খবর সে বাইরে চেপে যেতে পারলেও নিজের অন্তরের কাছে সে কিছুই লুকাতে পারে না। সেজন্য অন্তরের এই গভীরতম প্রদেশটি মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী ও সর্বাধিক আপন। এ স্থানের সাথে প্রতারণা করার সাধ্য কারো নেই। পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অদৃশ্য ও অনুভূতিস্তরের এই স্থানটির গতি-প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে তার বিস্তীর্ণ কর্মজগত। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বার বার অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যেমন তাকিদ দিয়েছেন তেমনি এটা অর্জনের উপরই মানুষের সফলতা, ব্যর্থতাকে নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا 'যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করল সে-ই সফল, আর ব্যর্থ সে-ই যে নিজের অন্তঃকরণকে কলুষিত করল' *(শামস্ ৯-১০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلا وإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضغَةً إِذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّه ، وإِذَا فَسَدَت فسَدَ الجَسَدُ كُلُّه ، أَلا وهِيَ القَلبُ 'সাবধান! মানুষের দেহের অভ্যন্তরে একটি পিণ্ড রয়েছে, যদি তা পরিশুদ্ধ হয় তবে সমস্ত দেহই পরিশুদ্ধ হয়; আর যদি তা বিকৃত হয়ে যায় তবে সমস্ত দেহই বিকৃত হয়ে যায়। সেটা হল কলব বা আত্মা'। (*মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/* ২৭৬২)

পবিত্র কুরআনে মানুষের নফস বা অন্তরের তিন ধরনের প্রকৃতি উল্লেখিত হয়েছে। ১. **মুত্বমায়িন্নাহ** (প্রশান্ত আত্মা): সে অন্তর যে তার প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর আনুগত্যেই সুস্থির হয়েছে। যে আল্লাহ্‌র দাসত্বে, তাঁর স্মরণে ও ভালবাসায় প্রশান্তি অর্জন করেছে। বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছুই তাঁর উপর সমর্পণ করেছে। তাঁর ভবিতব্যকে (কাযা ও কদর) অম্লান বদনে গ্রহণ করেছে। তাঁর সাক্ষাৎ ও প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছে এবং এক মুহূর্তের জন্যও যে অন্তর প্রভুর যিম্মাদারী থেকে বিচ্যুৎ হয় না। ২. **লাওয়ামাহ** (ভর্ৎসনাকারী আত্মা): যে অন্তর মানুষকে তার কর্তব্যচ্যুতির জন্য নিরন্তর ভর্ৎসনা করে ও ধিক্কার জানায়। ৩. **আম্মারাহ** (কুমন্ত্রণাদানকারী আত্মা): যে আত্মা মানুষকে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার জন্য প্ররোচণা দেয়। যে তার অনুগত হয়ে খারাপ পথে পা বাড়ায় তাকে সে যাবতীয় অকল্যাণ ও হীনকর কাজে প্রলুব্ধ করে। অন্তরের এরূপ প্রকৃতি মূর্খতা ও যুলুম থেকে সৃষ্ট। কেননা মানবাত্মা মূলতঃ অজ্ঞ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থাতেই পৃথিবীতে আগমন করেছে। আল্লাহ ইলহামের মাধ্যমে তাতে জ্ঞান ও ন্যায়বিচারের গুণাবলী সংযুক্ত করে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন তবে কোন আত্মাই পরিশুদ্ধ হত না। তিনি যার জন্য কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেছেন তাকে পরিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি দান করেছেন। আর যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেননি তাকে তার অবস্থানে তথা মূর্খতা ও পাপাচারের উপর ছেড়ে দিয়েছেন *(নূর ২১)*।

আল্লাহ বলেন, 'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' *(ফাজর ২৭)*।

আত্মশুদ্ধির পরিচয় ও প্রকারভেদ :

আত্মশুদ্ধির বিষয়টি দুইভাবে ব্যাখ্যা দেয়া যায়। ১. নঞর্থক: যাবতীয় পাপ, অন্যায় ও অপবিত্র কাজ থেকে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ যাবতীয় অসদ্‌গুণাবলী বর্জন করা। অসদ্‌গুণাবলী হলো- শিরক, রিয়া, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ঘৃণা, কৃপণতা, ক্রোধ, গীবত, কুধারণা, দুনিয়ার প্রতি মোহ, আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, জীবনের প্রতি অসচেতনতা, অর্থহীন কাজ করা, অনধিকার চর্চা প্রভৃতি।

২. সদর্থক: উত্তম গুণাবলী দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করা অর্থাৎ প্রশংসনীয় গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে পরিত্যাগকৃত অসদ্‌গুণাবলীর শূন্যস্থান পূরণ করা। সদ্‌গুণাবলী হল তাওহীদ, ইখলাছ, ধৈর্যশীলতা, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা, তওবা, শুকর বা কৃতজ্ঞতা, আল্লাহভীতি, আশাবাদিতা, লজ্জাশীলতা, বিনয়-নম্রতা, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন, পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ, মানুষের প্রতি দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ, পরোপকার প্রভৃতি।

পবিত্র কুরআনে দু'টি অর্থেই 'তাযকিয়াতুন নফস' শব্দটির ব্যবহার এসেছে। তাযকিয়াতুন নাফস সম্পর্কে আরেকটি সংজ্ঞা দেওয়া যায় এভাবে যে, অন্তরকে শিরক ও তার যাবতীয় শাখা-প্রশাখা থেকে মুক্ত রাখা, তাওহীদ ও তার সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা, আল্লাহ্‌র সুন্দরতম নামগুলোর গুণে গুণান্বিত হওয়া, প্রভুত্বের যাবতীয় উপকরণকে বর্জন করে পূর্ণাঙ্গভাবে এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা এবং প্রতিটি বিষয়ে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দেখানো পথ পুংখানুপুংখ অনুসরণ করা।

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব :

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে আত্মশুদ্ধি অর্জনকারীর সফলতার নিশ্চয়তা ও তা পরিত্যাগকারীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারে এগারো বার কসম করেছেন (*সূরা শামস্*)।

২. আত্মা মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হয় যখন সে তাকে পাপাচার ও সীমালংঘনের দিকে আহ্বান করে। কেননা এই অপরিশুদ্ধ, পাপাচারী, ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) অন্তরের অনিষ্ট থেকে অধিক পরিত্রাণ চাইতেন- اللهمَّ آتِ نفسي تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا ، 'হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা দাও এবং তাকে পরিশুদ্ধ কর। তুমিই অন্তরের সর্বোত্তম

পরিশোধনকারী এবং তুমিই তার অভিভাবক ও প্রতিপালক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬০)*।

৩. আত্মশুদ্ধি অর্জন জান্নাত লাভের উপায়। আল্লাহ বলেন, وأما مـــن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المـــأوى 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে এবং নিজের অন্তরকে কুপ্রবৃত্তি থেকে দূরে রাখে, জান্নাতই হবে তার জন্য চূড়ান্ত আবাসস্থল' *(নাযি'আত ৪০)*।

৪. আত্মা হল ঈমানের সংরক্ষণস্থল। আর ঈমান হল মানুষের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। যদি ঈমান না থাকে তাহ'লে মানুষের সমগ্র জীবনই বৃথা। তাই এ সম্পদকে সুরক্ষা ও তার পরিবৃদ্ধি সাধনের জন্য অন্ত রজগতের পরিশুদ্ধি নিশ্চিত করতে হয়।

৫. মুসলিম উম্মত আক্বীদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও ব্যবহারিক প্রতিটি ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ধারক-বাহক। তাই কোন ধরনের অকল্যাণকর উপাদান যেন তার অন্তরকে বক্র করে না ফেলে বা সংকীর্ণতায় নিক্ষেপ না করে সেজন্য তাকে সদা সতর্ক থাকতে হয়। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে সত্যবাদী ও পরিচ্ছন্ন অন্তরের অধিকারী, যা পাপাচার, অবিচার, প্রতারণা ও হিংসা থেকে মুক্ত *(ইবনে মাজাহ হা/৪২১৬, সনদ ছহীহ)*।

৬. তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট ও আস্থাবান আত্মা মানুষের জন্য দুনিয়াবী জীবনে প্রশান্তি অর্জন ও জটিলতা মুক্তির কারণ এবং পরকালীন জীবনে গণীমতস্বরূপ। যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই নেক আমল করে সে ব্যক্তি তার সহগামীদের জন্য নিখাদ ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু বহন করতে পারে না। এরূপ নির্ভার, প্রশান্ত, বিদ্বেষমুক্ত আত্মা এমন একটি নে'আমত যা আল্লাহ্ জান্নাতীদেরকে দান করবেন *(হিজর ৪৭)*।

৭. মানুষ সবসময় পূর্ণতার আকাংখী। এই পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য। মানুষ নিজের শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য যেভাবে নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করে ও যাবতীয় অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য সার্বক্ষণিক পরিচর্যা করে, ঠিক তেমনি অন্তরকে পবিত্র রাখার জন্য নিয়মিত খাদ্য প্রদান ও পরিচর্যা প্রয়োজন। ঈমান ও নেক আমল হল সেই খাদ্য। শরীর যেমন খাদ্য পেয়ে শক্তি অর্জন করে তেমনি অন্তরও নেক আমলের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করে।

সাইয়েদ কুতুব বলেন, 'মানুষ একই সাথে মাটির তৈরী ও আল্লাহ্র নির্দেশপ্রাপ্ত সত্তা। তাই তার মধ্যে পাপ-পুণ্য, কল্যাণ-অকল্যাণ দুই ধারার প্রকৃতি সমানভাবে ক্রিয়াশীল। এ কারণে সে কোনটি কল্যাণকর, কোনটি অকল্যাণকর তা বাছাই করে যেকোন দিকে নিজেকে পরিচালনা করতে সক্ষম। আল্লাহ মানুষের মধ্যে এই ক্ষমতাকে সহজাত করে দিয়েছেন। যাকে তিনি কুরআনে কখনো 'ইলহাম' দ্বারা প্রকাশ করেছেন, যেমন- '(অন্তরকে) তিনি অসৎকর্ম ও সৎকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন' *(শামস ৮-৯)*। কখনো প্রকাশ করেছেন হিদায়াত দ্বারা, যেমন- 'আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি' *(বালাদ ১০)*। এই সহজাত দু'টি প্রবণতার সাথে মানুষের অন্তরাত্মায় আরো একটি বোধগম্য ও প্রভাবশালী শক্তি রয়েছে যার নাম 'বিবেক'। যে ব্যক্তি এই বিবেকশক্তিকে অন্তরাত্মার পরিশুদ্ধিতে নিয়োজিত করে, নেক আমলের মাধ্যমে তার প্রবৃদ্ধি সাধন করে এবং অন্যায়-অকল্যাণের বিরুদ্ধে তাকে বিজয়ী করতে পারে সে-ই সফল; আর যে ব্যক্তি বিবেকশক্তির প্রতি অবিচার করে এবং তাকে দুর্বল করে ফেলে সে ব্যক্তি ব্যর্থ' *(ফী যিলালিল কুরআন, পৃঃ ৮/৪৮)*।

আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায় :

নিয়মিত পদক্ষেপ :

১. হালাল-হারাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা: জীবনের সর্বক্ষেত্রে হালাল-হারাম বাছাই করে চলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। আত্মাকে সর্বতোভাবে পরিশুদ্ধ রাখার জন্য যা অত্যাবশ্যক। যাবতীয় বদগুণাবলী থেকে নিজেকে পরহেয করে রাখতে হবে। নিয়মিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে এক সময় তা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে মানুষের স্বভাবগত হয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেন, 'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন' *(আনকাবূত ৬৯)*।

২. আত্মাকে বিভিন্ন উত্তম চরিত্র দ্বারা পরিমার্জন ও পরিশোধন করা : নিয়মিতভাবে সৎগুণাবলী অনুশীলনে তা সহজাত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

৩. ফরয ইবাদতসমূহ নিয়মিত আদায় করা : কেননা ফরয ইবাদত আল্লাহ্র আনুগত্যের সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। রাসূল (ছাঃ) হাদীছে কুদসীতে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ বলেন, وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتهُ عليه 'বান্দা আমার নিকটতর হ'তে পারে না এমন কোন আমল দ্বারা যা আমার নিকট অধিক প্রিয়তর হ'তে পারে আমি যেটা ফরয করেছি তা (ছালাত)অপেক্ষা' *(বুখারী, মিশকাত হা/২২৬৬)*।

৪. অধিকমাত্রায় নফল ইবাদত করা : কেননা নফল ইবাদতকারী ব্যক্তিকেও আল্লাহ তার নৈকট্যের সুসংবাদ দিয়েছেন *(ঐ)*। নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি অধিক বিনয়াবনতভাব প্রকাশ পায়, যা আত্মার পরিশুদ্ধিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে।

৫. পবিত্র কুরআন পাঠ করা ও তাতে চিন্তা-গবেষণা নিয়োজিত করা : কুরআন পাঠ অন্তরের কালিমা দূর করে দেয়। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বার বার এই কুরআনকে গবেষণা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আত্মার প্রশান্তিতে কুরআন তেলাওয়াতের ভূমিকা যে কত অপরিসীম পবিত্র কুরআনে ও বহু হাদীছে তা বর্ণিত হয়েছে।

৬. সৎসঙ্গ নিশ্চিত করা : সৎস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তির সংসর্গে থাকলে অজ্ঞাতসারেই তার সদ্গুণ নিজের অন্তরে প্রবেশ করে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) সৎ সঙ্গী নির্বাচনের জন্য জোর তাকীদ দিয়েছেন।

বিশেষ পদক্ষেপ :

১. তওবা : আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রথম পদক্ষেপ হল তওবা করা। তওবার মাধ্যমেই মানুষ পাপ বর্জন করে পুণ্য অর্জনের তৃপ্তি অনুভব করতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ তোমরা সকলে আল্লাহ্র সমীপে তওবা করো যেন তোমরা কৃতকার্য হ'তে পার' *(নূর ৩১)*। তিনি আরো বলেন, 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট প্রকৃতভাবে তওবা করো; আশা করা যায় আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন' *(তাহরীম ৮)*।

২. আল্লাহ্র স্মরণ করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা : আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُـــوَ لَـــهُ قَـــرِينٌ 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী' *(যুখরুফ ৩৬)*। আল্লাহ্ বলেন, 'তারা (মু'মিনরা) কখনো পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়লে অথবা অন্যায় কাজ করে নিজের আত্মার উপরে যুলুম করে ফেললে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে' *(আলে ইমরান ১৩৫)*। '(মুমিনরা) রাত্রের শেষ প্রহরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে' *(আলে ইমরান ১৭)*। 'কেউ যদি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে কিংবা নিজের উপর যুলুম করে ফেলে অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায় সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল ও দয়াময় হিসাবেই পাবে' *(নিসা ১১০)*।

৩. প্রবৃত্তির কঠোর বিরুদ্ধাচরণ করা ও অসৎচিন্তাকে কোনভাবেই প্রশ্রয় না দেওয়া : আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে ক্রমাগতভাবে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়। কেননা প্রবৃত্তি মানুষকে শিথিলতা ও অবাধ্যতায় প্ররোচিত করে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আত্মাকে কু-প্রবৃত্তি হ'তে অবদমিত রাখল তার বাসস্থান হল জান্নাত' *(নাযি'আত ৪০)*। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, 'এই অনুশীলন করার সময় তাকে জানতে হবে যে, আজ সে যতবার এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে আগামী দিন তা তার জন্য ততধিক স্বস্তির কারণ হতে যাচ্ছে আর যতবার সে

শিথিল হচ্ছে তা আগামী দিন তার জন্য ততধিক কঠিনভাবে ধৃত হওয়ার উপলক্ষ্য হতে যাচ্ছে। তাকে মনে রাখতে হবে যে, তার কর্ম থেকে অর্জিত মুনাফা হল জান্নাতুল ফেরদাউসের সীমাহীন প্রশান্তিপূর্ণ আবাসস্থল এবং মহান প্রভুকে দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন। আর লোকসান হওয়ার অর্থ নিশ্চিত জাহান্নামে প্রবেশ ও প্রভুর দর্শন থেকে বঞ্চিত হওয়া। যে ব্যক্তি এই মানসিকতায় দৃঢ়প্রত্যয়ী হতে পারে, পার্থিব জীবনের হিসাব তার নিকট গৌণ হয়ে পড়ে। অতএব একজন প্রকৃত মু'মিনের কর্তব্য হল আত্মসমালোচনায় গাফলতি না করা এবং অন্তরের গতি-প্রকৃতি ও প্রতিটি পদক্ষেপকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। কেননা আত্মা এমন এক অমূল্য সম্পদ যা দ্বারা মানুষ সেই গুপ্তধনের অধিকারী হ'তে পারে যা অনন্তকাল ধরে কখনই নিঃশেষ হয় না। এই অমূল্য আত্মাকে যারা কলুষময় করে ধ্বংস করে ফেলে এবং তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে তার জন্য অবর্ণনীয় ক্ষতি ডেকে আনে সে ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বাধিক নির্বোধ ও বিচারজ্ঞানহীন ব্যক্তি। শেষ বিচারের দিনে সে তার পরিণতি জানতে পারবে। আল্লাহ বলেন, 'সেদিন প্রত্যেক আত্মা যা সৎকর্ম করেছে ও বদকর্ম করেছে তা উপস্থিত পাবে' *(আলে ইমরান ৩০)*, *(ইগাছাতুল লাহফান মিন মাছায়িদিশ শয়তান ১/৮৫ পৃঃ)*

৪.আল্লাহর আনুগত্যে থাকার জন্য নিজেকে ধমক দেওয়া : অন্যায় কাজের জন্য অন্তরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করলে নাফসে আম্মারাহ (কুপ্রবৃত্তি) নাফসে মুতমায়িন্নায় (প্রশান্ত আত্মা) পরিণত হয়। অন্যকে উপদেশ দানের পূর্বে নিজেকে বারবার উপদেশ দিতে হবে। সবসময় মৃত্যু ও পরকালের কথা চিন্তা করতে হবে। নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যেন অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে, দারিদ্রের পূর্বে প্রাচুর্যকে, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে পুরোপুরিভাবে পরকালীন প্রস্তুতিতে কাজে লাগানো যায়।

৫.নিজ সম্পর্কে সুধারণা না করা ও নিজের সৎকর্ম নিয়ে গর্ব অনুভব না করে তা আল্লাহ্র প্রতি সমর্পিত করা : নিজের প্রতি সুধারণার একটা খারাপ প্রতিক্রিয়া হল তা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, 'আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সন্তুষ্ট বোধ করা নেহায়েত বোকামী ও আল্লাহ্র হক্ব সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। অপরদিকে নিজের প্রতি সুধারণা জন্ম দেয় অহংকার, আত্মগর্ব ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ বদ্উপসর্গ যা অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্য কবীরা গুণাহের চেয়ে নিকৃষ্ট। এজন্য পাপীকে সংশোধন করার পূর্বে নিজেকে সংশোধনে মনোযোগী হওয়া যরূরী। একজন পাপীকে লজ্জিত করার চেয়ে নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান করা অধিক উত্তম। আল্লাহ্র আনুগত্য, আল্লাহ্র প্রতি শোকরগোযার হওয়া, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এটাই অধিক কার্যকর *(মাদারিজুস সালিকীন ১/১৭৫)*।

৬.আমলকে রিয়া (লোকপ্রদর্শনী) থেকে বিরত রাখা : লোক দেখানোর জন্য অথবা অন্যের নিকট প্রশংসা পাওয়া, দোষারোপ থেকে রেহাই পাওয়া, সম্মান-প্রতিপত্তি অর্জন, ক্ষমতা লাভ করা ইত্যাদি অসৎ উদ্দেশ্যে কৃত আমল আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এ সমস্ত কাজ মানুষকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিখাদচিত্ত হওয়া (ইখলাছ) থেকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে তার নেকআমল আর অন্তর থেকে পালিত হয় না। তার অন্তর হয়ে পড়ে মৃত। তা আর আলোকিত হ'তে পারে না, পারে না সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য চিহ্নিত করতে। হারিয়ে ফেলে আল্লাহ্র বন্ধু ও আল্লাহ্র শত্রুদের মাঝে ব্যবধান করার যোগ্যতাটুকুও *(ঐ ১/১৭৫)*।

৭.আত্মসমালোচনা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে মানব সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিয়েছেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিৎ, আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে তা চিন্তা করা' *(হাশর ১৮)*। ওমর (রাঃ) এক খুৎবায় বলেন, হে মানুষ! তোমরা নিজেদের হিসাব নিজেরাই গ্রহণ কর, চূড়ান্ত দিবসে হিসাব গৃহীত হওয়ার পূর্বেই। তোমাদের অন্তরাত্মাকে তোমরা পরিমাপ কর চূড়ান্ত দিনের পরিমাপের পূর্বেই। কেননা আজকের দিনে নিজেকে পরিমাপ করা আগামী দিনের তুলনায় বহুগুণে সহজ। সেদিনের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজেকে অলংকৃত করে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে নাও, যেদিন কোন গোপনকারীর গোপনীয়তা আর অপ্রকাশ্য থাকবে না। মায়মূন বিন মিহরান বলেন, কোন ব্যক্তি মুত্তাকী হ'তে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের হিসাব গ্রহণ করে, যেমন সে অন্যের কাছে হিসাব নেয় যে, সে কোথা থেকে খাদ্য ও পোষাক সংগ্রহ করেছে। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, এমন অনেকে রয়েছে যে নেক আমল প্রচুর করে কিন্তু নিজের খারাপ গুণসমূহ দূর করার অবসর পায় না। ফলে অচিরেই তার মাঝে রিয়া, আত্মগর্ব ইত্যাদি বদগুণ পাহাড়ের মত স্থায়ী জায়গা করে নেয়, যাকে সে কিছুই মনে করে না। এজন্য আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি সে-ই যে সৎ আমল অধিক করে এবং সতর্কতার সাথে অসৎ গুণ থেকে দূরে থাকে। আল্লাহ বলেন, 'তারা (মু'মিনরা) রাতের কম অংশেই নিদ্রা যেত এবং শেষ রাতে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত' *(যারিয়াত ১৮)*।

৮.কম ঘুমানো, কম খাওয়া ও কম কথা বলা : আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অতিমাত্রায় কথা বলা অন্তরকে আবশ্যকীয়ভাবে কঠিন করে তোলে। আর কঠিন অন্তরের মানুষের অবস্থান আল্লাহ থেকে সবচেয়ে দূরে। অধিক মাত্রায় খানা-পিনা শয়তানী প্রবৃত্তিকে উস্কে দেয় এবং ঘুম বৃদ্ধি করে দেয়। আর অধিক ঘুম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করার সাথে সাথে আলস্য ও কর্মক্ষমতা হ্রাসেরও কারণ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন।

৯.ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের গুণ দ্বারা সুশোভিত হওয়া : প্রবৃত্তির উপর বিজয় লাভ করা, হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা ও আল্লাহ্র আনুগত্যে অটল থাকার জন্য ধৈর্য অবলম্বন অপরিহার্য। আত্মশুদ্ধির দু'টি দিক 'অর্জন' ও 'বর্জন' ধৈর্য ব্যতীত আত্মস্থ করা অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ধারণের অপরিসীম পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ধৈর্য হল আলো স্বরূপ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১)*। আর আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে পথভ্রষ্টতা থেকে পরিত্রাণ দেয় এবং প্রশান্তি ও স্থিরতা দান করে। এজন্য সুফিয়ান ছাওরী বলেন, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে দ্বীনের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। আল্লাহ বলেন, 'তারা ছবর করত এবং আমার আয়াতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখত বলে আমি তাদের মধ্য থেকেই নেতা নির্বাচন করেছিলাম' *(সিজদা ২৪)*।

১০. দো'আ করা : সর্বোপরি আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য আল্লাহ্র নিকট আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করা অপরিহার্য। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহই কেবলমাত্র মানুষের সৎপথ প্রাপ্তি ও আত্মশুদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে *(নূর ২১)*। দো'আ মু'মিনের অস্ত্রস্বরূপ। দো'আর মাধ্যমেই সে আল্লাহ্র কাছে অকল্যাণ থেকে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। রাসূল (ছাঃ) এজন্য দো'আ করতেন, اللَّهُمَّ اهْدِنِى لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ وَأَحْسَنِ الأَعْمَـــالِ لاَ يَهْـــدِى لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَقِنِى سَيِّئَ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ لاَ يَقِى سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ – 'হে প্রভু! তুমি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্র ও সর্বোত্তম আমলের দিকে পথ-প্রদর্শন কর। কেননা উৎকৃষ্টতার দিকে পথপ্রদর্শন করার সাধ্য তুমি ছাড়া আর কারো নেই। তুমি আমাকে অসৎ চরিত্র ও অসৎ আমল হ'তে পরিত্রাণ দাও। কেননা তুমি ব্যতীত কেউই বদস্বভাব থেকে উদ্ধার করতে পারে না' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৮২০)*। اللَّهُـــمَّ أَنْعِشْـــنِي واجْبُرْنِي واهْدِنِي لِصالِحِ الأَعْمالِ والأَخْلاقِ فإِنَّهُ لا يَهْدِي لِصـــالِحِها ولا يَصْرِفُ سَيِّئَها إِلاَّ أَنْتَ 'হে প্রভু! আমাকে পরিশুদ্ধ করে দাও, আমাকে সংশোধন করে দাও এবং সৎকর্ম ও সৎচরিত্রের দিকে আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। কেননা সুপথপ্রদর্শন করা ও কুপথ থেকে ফিরিয়ে আনার সাধ্য তুমি ব্যতীত কারো নেই' *(আল জামে'উছ ছাগীর হা/২১৪৬)*।

আল্লাহ আমাদের সকলকে পরিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। - আমীন!

শিরক ও আজকের সমাজ

ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

পৃথিবীতে পাপ নামক যত প্রকারের কার্যক্রম রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ও বড় পাপ হচ্ছে শিরক। শিরক সবচেয়ে বড় পাপ হওয়ার মূল কারণ হল এটা সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তার প্রতি প্রভাব ফেলে। যা মহান আল্লাহ বরদাশত করতে পারেন না। এই পৃথিবীতে হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত যে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী ও রাসূল এসেছেন, তাঁদের মৌলিক প্রধান কাজ ছিল শিরক উৎখাত করতঃ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। তাঁরা প্রত্যেকেই আজীবন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে শিরকের মূল শিকড় উপড়ে ফেলার অবিরাম সংগ্রাম করে গেছেন। সাথে সাথে সমাজের সর্বস্তরে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁদের তিরোধানের পর এ দায়িত্ব হক্বপন্থী আলেমদের উপর অর্পণ করে গেছেন। বড় পরিতাপের বিষয়, আজ সমাজের সর্বস্তরে শিরকের জয়জয়কর চলছে। শিরক যেন একটি মামুলী ব্যাপার। মানুষ একে হালকা জ্ঞান করছে। ফলে অহরহ তারা অগণিত শিরক করলেও তাদের মাঝে অনুশোচনার কোন লক্ষণ নেই।

শিরকের পরিচয় :

আরবী 'শিরক' শব্দটি পবিত্র কুরআনে ও ছহীহ হাদীছে ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল- অংশীদার বা শরীক হওয়া। আর কুরআন ও হাদীছে শিরক শব্দটি দ্বারা আল্লাহর রুবূবিয়াত, উলূহিয়াত ও আসাম ওয়াছ ছিফাতের মধ্যে কাউকে অংশীদার বানানোকে বুঝানো হয়েছে।

শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞায় ডঃ ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ বলেন, আল্লাহর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তথা তাঁর জাত, গুণ ও প্রভুত্বে সমকক্ষ স্থাপন করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত মনে করাই শিরক। ডঃ ছালেহ বিন ফাওযান বলেন, আল্লাহর উলূহিয়াত ও রুবূবিয়াতের ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলে, শিরক হল আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ গ্রহণ করা এবং আল্লাহর মত তাকে ভালবাসা।

'কিতাবুত তাওহীদ' প্রণেতার মতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করা, ইবাদতের মাধ্যম সাব্যস্ত করা কিংবা ইবাদতে অংশী স্থাপন করাকে শিরক বলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিরকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি (আল্লাহ) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' *(বুখারী, হা/৪২০৭)*। মোট কথা শিরক হল প্রতিপালন, আইন, বিধান ও ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উলূহিয়্যাহ বা ইবাদতের ব্যাপারে অংশীদার সাব্যস্ত করা এভাবে যে, আল্লাহর সাথে অন্যকে আহ্বান করা অথবা বিভিন্ন প্রকার ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। যেমন যবেহ করা, নযর বা মানত করা, ভয় করা, আশা করা এবং ভালবাসা।

শিরকের উৎপত্তি :

আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যকার ব্যবধান প্রায় সহস্রাব্দ ছিল। এ সময় মানুষ তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। সে সময় কোন শিরক পৃথিবীতে ছিল না। দুনিয়াতে প্রথম শিরক সংঘটিত হয়েছিল নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে। আর তা হয়েছিল সৎ ও বুযর্গ লোকদের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, 'তারা বলল তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ কর না, আর তোমরা ওয়াদ, ইয়াগূছ, ইয়াঊক এবং নাসরকেও ত্যাগ কর না' *(নূহ ২৩)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, এ আয়াতে যে ক'টি নাম এসেছে এগুলো নূহ (আঃ) এর কওমের বুযর্গ লোকদের নাম। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের প্ররোচিত করল, তারা যেন ঐসব বুযর্গগণ যেসব আসরে বসতেন সেখানে তাদের প্রতিমা বানিয়ে রাখে এবং তাদে নামে এগুলোর নামকরণ করে। তারা তাই করল। তবে এগুলোর উপাসনা হত না। এসব লোক মৃত্যুবরণ করার পর ক্রমান্বয়ে তাওহীদের জ্ঞান বিস্মৃত হল, তখন এগুলোর উপাসনা ও পূজা হতে লাগল *(বুখারী, হা/৪৯২০)*।

শিরকের প্রকারভেদ :

শিরক তিন প্রকার। যথা **(১) আশ-শিরক ফির রুবূয়িইয়াহ :** আর তা হচ্ছে আল্লাহর কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বে কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা, অন্য কাউকে অংশীদার বানানো। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, গায়েব বা অদৃশ্যের খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও গায়েবের খবর জানতেন না *(আ'রাফ ১৮৮)*।

(২) আশ-শিরক ফিল উলূহিইয়াহ : ইবাদতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করার নাম আশ-শিরক ফিল উলূহিয়াহ বা ইবাদতে শিরক। ইবাদত হতে হবে সম্পূর্ণ শিরকমুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না' *(নিসা ৩৬)*। ইবদাতে শিরক দু'প্রকার **(ক) বড় শিরক :** আর তা হল ইবাদতের প্রকারগুলোর কোন একটি প্রকার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা। যেমন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে দো'আ করা, সিজদা করা, মানত করা, মৃত ব্যক্তি, জিন কিংবা শয়তানের প্ররোচণাকে ভয় করা। আর বড় শিরক কয়েক ভাগে সম্পাদিত হতে পারে। (১) দাওয়াত বা আহ্বানে শিরক। বিপদ-আপদে আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা এ ধরনের শিরক *(আনকাবূত ৬৫)*। (২) আনুগত্যে শিরক। আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কারো জন্য আনুগত্য প্রকাশ করা *(তাওবা ৩১)*। (৩) ভালবাসায় শিরক। মুমিনদের ভালবাসা হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে আল্লাহর ন্যায় ভালবাসা শিরক। আর ভালবাসার নিদর্শন হল আদেশ-নিষেধকে বাস্তবায়ন করা *(বাক্বারাহ ১৬৫)*।

(খ) ছোট শিরক : যেসব কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ শিরকের দিকে ধাবিত হয় সেসব কথা ও কাজকে ছোট শিরক বলা হয়। যেমন সৃষ্টির ব্যাপারে এমনভাবে সীমালংঘন করা, যা ইবাদতের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ছোট শিরক মানুষকে মুসলিম মিল্লাহ থেকে বের করে না। কিন্তু তাওহীদের ঘাটতি করে। আর উহা বড় শিরকের একটি মাধ্যম। ছোট শিরক আবার দু'প্রকার (১) প্রকাশ্য শিরক : উহা কথা ও কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। কথার শিরক হল আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা *(তিরমিযী হা/১৫৩৫)*। কাজের মাধ্যমে শিরক হল বিপদ দূর করার জন্য সুতা ও কড়া ব্যবহার করা, বদ নযর থেকে বাঁচার জন্য তাবীয-কবজ ঝুলানো। (২) গুপ্ত শিরক : গুপ্ত শিরকের উদাহরণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এ উম্মতের শিরক রাতের আঁধারে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়া পদাচারণার চেয়েও গুপ্ত

বা সূক্ষ্ম' *(ছহীহুল জামে, হা/২৩৩)*। আর এ ধরনের শিরক হল ইচ্ছা ও নিয়তের দ্বারা। যেমন লোকদেখানো ও সুখ্যাতি বা সুনামের জন্য কোন কাজ করা।

(৩) আশ-শিরক ফিল আসমা ওয়াছ-ছিফাত :

এই শিরক হল আল্লাহর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সৃষ্টির গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা। যেমন এ ধরনের কথা বলা যে, আল্লাহ্‌র পা আমাদের পায়ের মত, আল্লাহর চেহারা অমুকের চেহারার মত ইত্যাদি। আমরা আল্লাহকে একমাত্র গাওছ বা ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করি। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে গাওছ বলা এ জাতীয় শিরক। এ সকল প্রকার শিরক থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

শিরক ও বর্তমান সমাজচিত্র :

শিরক ও বর্তমান সমাজচিত্রের কথা বলতে গেলে গা শিউরে উঠে। কেননা এর মত এক অমার্জনীয় অপরাধ মানুষ নির্বিঘ্নে করে চলেছে। এটা যেন তেমন কোন অন্যায় নয়। ছোট-খাট বিষয়। করা না করা সমান। অথচ এর বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত। যা খুবই ভয়াবহ। আমাদের জীবন পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ আমাদের উপর পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। তা হাতে কলমে বাস্তবতার নিরিখে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পাঠিয়েছেন। বিধায় সকল সমস্যার সমাধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকেই আমাদেরকে নিতে হবে।

হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে যদি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের মডেল মনে করি কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে লক, হিউম, লিংকন, জেফারসন, লেলিন, মাওসেতুং বা কার্লমার্কসের দেয়া বিধান এবং নীতি অধিকতর প্রাসঙ্গিক এবং যুগোপযোগী মনে করি, তবে কুরআন এবং রাসূলের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা থাকল না। আমাদের জীবন সমস্যা সমাধানের জন্য আল-কুরআন হতে কিছু কিছু বিধান গ্রহণ করা এবং রাষ্ট্র ও অর্থনীতি পরিচালনার জন্যে অন্য ব্যক্তি এবং আর্দশ থেকে কিছু কিছু বিধানকে অধিকতর যুগোপযোগী মনে করা শিরক। কিছুটা আল্লাহ্‌র বিধান আর কিছুটা মানুষের দেয়া বিধান এটা যে, শিরক এতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ বর্তমান সমাজে ঘটছে তাই। আল্লাহর বিধান ও মানুষের তৈরি করা বিধানের সংমিশ্রণ জগাখিচুড়ী করে চলছে সমাজ ব্যবস্থা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইন ও বিধানদাতা মনে করা শিরক। কারণ সৃষ্টির যাবতীয় আইন ও বিধান প্রদানের ক্ষমতা নিরংকুশভাবে আল্লাহ্‌র। আল্লাহ বলেন, 'সাবধান সৃষ্টি তাঁর এবং হুকুমও তাঁর' *(আ'রাফ ৫৪)*। কাজেই কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আইন ও বিধানদাতা মনে করা এবং আইনের উৎস বলে বিশ্বাস করা শিরক। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, আইনদাতা, সন্তানদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা হিসাবে বিশ্বাস করাও শিরক। আমরা জনগণের সর্মথন নিয়ে নির্দিষ্ট এক স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠের দোহাই পেড়ে যে অসংখ্য শরী'আত বিরোধী আইন তৈরী করে সমাজে প্রয়োগ করছি, এটা কোন পর্যায়ে যাবে তা বুঝতে আশা করি পাঠক সমাজের বাকি নেই। যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ভাল জানেন তাদের জন্য কল্যাণকর বিধানের কথা। মানুষ মানুষের জন্য স্বচ্ছ কল্যাণের আইন রচনা করতে পারে না।

আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সূর্যকে সিজদা কর না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন' *(ফুছছিলাত ৩৭)*। ঠিক মহানবী (ছাঃ) আল্লাহর কাছে দো'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তি বানিও না। যে জাতি তাদের নবী-রাসূলদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে, তাদের উপর আল্লাহর গযব তীব্র হয়ে উঠেছে' *(মুওয়াত্তা, মিশকাত হা/৭৫০)*। তাই যদি কেউ কোন নবী, ওলী, জিন পরীকে, কবরকে, পশু-প্রাণীকে, নিশানাকে, কোন পবিত্র বস্তুকে বা সরদারকে সিজদা করে, রুকু করে, তার জন্য ছওম রাখে, হাত বেধে দাঁড়িয়ে নৈকট্য প্রার্থনা করে, তার নামে ছড়ি দাঁড় করায়, ফেরার সময় উল্টোভাবে ফিরে, কবরকে চুম্বন করে, কবরে বাতি জ্বালায়, কবর যিয়ারতের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে আসে, কবরে আলোর ব্যবস্থা করে, কবরে গিলাফ দ্বারা আবৃত করে, কবরের উপর চাদর টাঙ্গিয়ে দেয়, সামিয়ানা টাঙ্গায়, কবরের চৌকাঠে চুম্বন করে, কবরে সমাধিস্থ বুযুর্গ ব্যক্তির নিকটে হাত তুলে কিছু প্রার্থনা করে, কবরের খেদমত করে, কবরের পার্শ্ববর্তী গাছপালাকে সম্মান করে, কবরকে তাওয়াফ করে, কবরে হাত বুলায়, লালশালুতে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে থাকে, কবরের মাটি গায়ে মাখে, তার সামনে মিনতি ভরে দাঁড়ায়, নিজের উদ্দেশ্য ও অভাবের কথা তুলে ধরে, সুস্থতা কামনা করে ও সন্তান চায়। মোটকথা এ ধরনের কাজ করলে নিঃসন্দেহে সে শিরক করল। এসব শিরক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সমাজে এর সবগুলোই ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে।

খলীফা ওমর (রাঃ)-এর সময় তাকে সংবাদ দেয়া হল যে, কতিপয় মানুষ ঐ বৃক্ষের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে যে বৃক্ষের নীচে ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করেছিলেন। অতঃপর তিনি [ওমর (রাঃ)] ঐ বৃক্ষকে কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন *(ফাৎহুল বারী ৭/৪৪৮)*। কিন্তু বর্তমানে আমরা সংস্কৃতির নামে, আধুনিকতার নামে অহরহ শিরক করে চলেছি। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও শহীদ দিবস আসলে আমরা শহীদ মিনারে ও স্মৃতিসৌধে গিয়ে ফুলের স্তবক দেই, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি, শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। প্রতিটি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মিনার তৈরী করে দেশে ভবিষ্যৎ কর্ণধার কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিরক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

অথচ সবচেয়ে বড় গুনাহ ও শিরক থেকে বেঁচে থাকার যথার্থ শিক্ষা দেয়াই উচিৎ ছিল এ দেশের তরুণ প্রজন্মকে। আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা মন্দিরে মূর্তিকে সামনে রেখে পূজা-অর্চনা করে, সিজদা করে। আর অন্যদিকে মুসলিমরা পীর-বুযুর্গদের মাটির নীচে দাফন করে কবর সামনে রেখে একই কায়দায় পূজা করে। তথা সিজদা করে, মানত করে, দো'আ করে, সম্মান প্রদর্শন করে, নীরবতা পালনসহ কত কিছু যার শেষ নেই বললেই চলে। আবার অতি আধুনিকতার দোহাই পেড়ে খোদ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামকারী ব্যক্তিবর্গও ইট-পাথর-বালু-সিমেন্টের তৈরী খাম্বা বা পিলারকে সামনে রেখে মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন করে, এক মিনিট নীরবতা পালন করে, পুষ্পস্তবক অর্পণ করে, নানা কায়দায় প্রার্থনা করে। এসব কিছুর মধ্যে মূলতঃ মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। বরং পর্যায়ক্রমে শেষেরটা বেশী হাস্যকর। শীতকালে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে সকাল, দুপুর, বিকাল তথা সারাদিনই একই রকম থাকে। সারাদিনই সূর্যের আলোর মুখ দেখা যায় না। ঠিক মূর্তিপূজা, কবর বা মাজার পূজা ও শহীদ মিনার পূজা একই সূত্রে গাঁথা। স্রেফ কিছু নিয়ম-নীতির পার্থক্য মাত্র। এছাড়াও ভক্তিভাজন পীর বা নেতা-নেত্রীর ছবিতে ফুলের মালা দেয়া, চিত্রের পাদদেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা, নীরবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, ভাস্কর্যের নামে শিক্ষাঙ্গন ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি স্থাপন করা ও তাকে সম্মান দেখানো, শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন বানিয়ে নীরবে সম্মান প্রদর্শন করা মূর্তিপূজার শামিল। যা শিরক।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব বা অদৃশ্যের খবর জানে না। তাই কেউ যদি মনে করে পীর সাহেব, হুযুরে কেবলা গায়েব জানে তাহলে তা শিরক হবে। সাথে সাথে জ্যোতিষী বা গণকের নিকটে যাওয়া ও

তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা, তাকে হাত দেখানোও শিরক। আবার অনেকে রোগমুক্তি, সন্তানলাভ, মুশকিলে আসান, মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভ, পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের প্রত্যাশা কিংবা নানাবিধ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দরগা-মাযারে দান-খয়রাত, গরু-ছাগল, টাকা-পয়সা, চাল, মিষ্টি, হাঁস-মুরগী, শিরনিসহ বিভিন্ন প্রকার জিনিস দিয়ে থাকেন। এসবগুলোও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কোন পশু-পাখি যবেহ করা শিরক। আবার আমরা আল্লাহ ব্যতীত অনেক কিছুর নামে শপথ বা কসম করি সেগুলোও শিরক। যেমন আমরা মাটি, দানা, চোখ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সন্তানের মাথায় হাত রেখে, পেটের সন্তানের সহ আরো অনেক কিছুর শপথ করি, যা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। যদি শপথ করতে হয় তাহলে সরাসরি আল্লাহর নামে শপথ করতে হবে। সৃষ্টি স্রষ্টার নামে শপথ করবে, সৃষ্টির নামে নয়। আমরা অনেক সময় বালা-মুছীবত দূর করার জন্য রিং, তাগা, কালো সুতা ও তাবীয ব্যবহার করি যা শিরক *(তিরমীযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। স্বামী-স্ত্রীর, দুই বন্ধু বা বান্ধবী তথা দু'জন ব্যক্তির মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ার জন্য তাবীয বা ঝাড়ফুঁক জাতীয় যেসব কৌশল অবলম্বন করা হয় তার সবগুলোই শিরক। আমরা অনেকে প্রভাতে দোকান খুলে প্রথম খরীদদারকে বাকী দিতে চাই না অমঙ্গলের আশংকায়। এরূপ ধারণা করাও শিরক। অমুক দিন অমুক গাছ বা বাঁশ কাটা যাবে না, ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখলে এই ক্ষতি হয়, এ জাতীয় বিশ্বাস শিরকের শামিল। আবার অনেক সময় সন্তানের নাম না বুঝে আব্দুন নবী তথা নবীর বান্দা, নূরুন্নবী তথা নবীর নূর, গোলাম রাসূল তথা রাসূলের গোলাম বা এরূপ নাম রেখে থাকি। এসবও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, মাযারকেন্দ্রিক পীর-ফকীর-গণক, তাবীয-কবয ইত্যাদি যে সকল কার্যক্রম রয়েছে তার সবই শিরক। আবার শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, মূর্তিসম্বলিত ভাস্কর্য, বিভিন্ন দিবস পালন কেন্দ্রিক যেসব কার্য সম্পাদিত হয় এর অধিকাংশের সাথেই শিরক জড়িত। আজকে সারা বিশ্বে দিবস পালনের যে প্রতিযোগিতা চলছে তার সাথে ইসলামী জীবনব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নেই। এভাবে শিরক ও শিরক সম্পর্কিত কার্যাবলী আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা ভয়াবহ। এভাবে আমরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে প্রতিনিয়ত নির্দ্বিধায় শিরক করে নিজেদেরকে জাহান্নামের খোরাক বানাচ্ছি। তাই আমাদের সকলকে শিরক সম্পর্কে সর্বাধিক সচেতন হতে হবে।

শিরকের ফলাফল ও পরিণতি :

আমাদের জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে অগণিত শিরক করা হয়ে যাচ্ছে। অথচ একবার ভেবেও দেখিনি যে, শিরককারীর শেষ পরিণতি বা ফলাফল কী। পাপ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে শিরক। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করল সে গুরুতর পাপে পাপী হল' *(নিসা ৪৮)*। লোকমান হাকীম তার সন্তানকে বলেছিলেন, 'হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নিশ্চয়ই শিরক বড় ধরনের যুলুম' *(লোকমান ১৩)*।

শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। মহান আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়ালু। বান্দার যত গুনাহ রয়েছে তিনি চাইলে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু শিরকের গুনাহ তিনি ক্ষমা করবেন না *(নিসা ৪৮, ১১৬)*। শিরক এমনই এক অপরাধ যে, শিরক করলে পূর্বের সকল আমল নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, 'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর শরীক স্থাপন করেন, তাহলে আপনার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন' *(যুমার ৬৫)*। আরো বলেন, 'যদি তারা শিরক করত তবে তাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যেত' *(আন'আম ৮৮)*। শিরক এমন এক গুরুতর অপরাধ যে, তা শিরককারীর জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেয় এবং জাহান্নাম অপরিহার্য করে দেয়। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৭২)*। একই মর্মে হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে *(মুসলিম হা/২৬৬৩)*।

শিরক ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার রাসূল মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত' *(তওবা ৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ে আর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে' *(হজ্জ ৩১)*। শিরক এমন এক জঘন্য অপরাধ যে অপরাধের কারণে উক্ত অপরাধীর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'নবী ও মুমিনদের জন্য উচিৎ নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তারা আত্মীয়ই হোক না কেন। বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী' *(তওবা ১১৩)*।

শিরকের ভয়াবহতা তার শেষ পরিণতির চিত্র দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। যা কল্পনা করাও কঠিন। তাই শিরক সম্পর্কে আমাদেরকে কতটুকু সচেতন হওয়া প্রয়োজন সে কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

সমাপনী :

পরিশেষে বলা যায়, শিরক মানব জাতির ক্ষতি সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ। অন্যান্য অপরাধ মানুষকে যতটা অপরাধে নিক্ষেপ করবে শিরকের অপরাধ তার যেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশী ভয়ংকর। অথচ এই শিরক বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে মিশে গেছে গভীরভাবে। বর্তমান সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতি, অনুষ্ঠানাদি, কৃষ্টি-কালচারের সাথে মিশে একাকার-বিলীন হয়ে গেছে। যা থেকে শিরককে পৃথক করা বড় দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। এরই প্রেক্ষিতে মানুষ হরহামেশা অজস্র শিরকী কর্মকাণ্ড করেও নিজেকে সভ্যতার চরম শিখরে উন্নীত বলে প্রমাণ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। অগণিত শিরক কেবল সভ্যতার দোহাই দিয়ে বর্তমান সমাজে সগৌরবে চালু আছে। এমনকি এই শিরক যে মহা অপরাধের কাজ তা তারা স্বীকারও করে না। যারা এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থান নিতে চায় তাদেরকে সম্মুখীন হতে হয় বাধা-বিপত্তির।

হে বর্তমান সময়ের শিক্ষিত সমাজ! আর কতদিন গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে মেকি সুখের নেশায় বিভোর থাকবে! এখন সময়ের দাবী গা ঝাড়া দিয়ে ওঠো। জেগে জেগে ঘুমের সময় আর নেই। ঐ শোন চারিদিকে সত্যের জয়গান প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে তোমায়। সারা পৃথিবীতে এখন ভিত্তিহীন, ভূয়া, দুর্নীতি, ভেজালবিরোধী শ্লোগান উঠেছে। তাই আমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে সূক্ষ্মভাবে সত্যানুসন্ধানে। আমাদের প্রতিটি আমলই হবে রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে। নতুবা সে আমল যে অসার হয়ে পড়বে তা নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। তাই আসুন! আমার সবাই হিংসা-দ্বন্দ্ব, ভুল বুঝাবুঝি, সর্বপ্রকার গোঁড়ামী পরিহার করে শিরকমুক্ত জীবন গড়ার শপথ গ্রহণ করি। আসমান ও যমীনের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্বের জয়গান জীবনের সর্বক্ষেত্রে, পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দেই। আল্লাহ আমাদের সে তাওফীক দান করুন। আমীন!!

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের ভূমিকা

ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ

মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে সাধারণভাবে তিনটি স্তরে শ্রেণী বিন্যাস করা যায়। শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য। এই তিন কালের মধ্যে সকল বিবেচনায় যৌবনকাল শ্রেষ্ঠ। সৌন্দর্যের কাল যৌবন, শক্তির কাল যৌবন, জীবনের পূর্ণতার কাল যৌবন। তাই কবি বলেছেন 'এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তার'। যৌবন যেমন সৃষ্টির স্বরূপ, পূর্ণতার স্বরূপ, তেমনি পরিপূর্ণ জীবনও প্রাণের স্বরূপ। যে কারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যৌবনের জয়গান গেয়েছেন। জীবন ও সমাজের পরিবর্তনে এবং তার সৌন্দর্য বর্ধনে তারুণ্য শ্রেষ্ঠ সহায়ক শক্তি। প্রসিদ্ধ কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে এই যৌবনের স্তব-গান। নবী করীম (ছাঃ)ও নানাভাবে যুবকদের স্বাগত জানিয়েছেন, ছাহাবাদেরকে জানাতে বলেছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'তিনি কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী তোমাদেরকে মারহাবা জানাচ্ছি। রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী আহলেহাদীছ।'

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও তারুণ্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তরুণ ও যুব সমাজের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক অভিভাষণে তিনি বলেন, 'জবাকুসুম সঙ্কাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ প্রভাতে তেমনি সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, তাহার স্তব-গান গাহিয়াছি। তরুণ অরুণের মতই যে তারুণ্য তিমিরবিদারী সে যে আলোর দেবতা। রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রঙ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন-সূর্য যথায় অস্তমিত দুঃখের তিমিরকুন্তলা নিশীথিনীর সেই ত লীলাভূমি'।

তারুণ্য বা বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। কারণ তরুণ ও তারুণ্য এক জিনিষ নয়। নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'বহু যুবককে দেখিয়াছি–যাহাদের যৌবনের উর্দির নীচে বার্ধক্যের কঙ্কাল-মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি– যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন'। এজন্য যারা 'পুরাতনকে মিথ্যাকে মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থকে', 'মায়াচ্ছন্ন নব-যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচ-কাওয়াজ করিতে জানে না', যারা 'অটল-সংস্কার-পাষাণ স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে', যারা 'নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে, আলোকপিয়াসী প্রাণ-চঞ্চল শিশুদের কল-কোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত' করে; বয়স তার যাই হোক না কেন সে কখনো তরুণ নয়। তরুণ তারাই 'যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড প্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অতল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে'।

তরুণ বা যুব সমাজই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। যুগে যুগে এই তরুণরাই পৃথিবীর বুকে বহু অসাধ্য সাধন করেছে। দ্বীন প্রচারেও যুব সমাজের অবদান অনস্বীকার্য। ইসলামের আদি যুগ থেকেই শত বাঁধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনা হৃদয়ে ধারণ করে দ্বীনের পথে বহু যুবক হাসি মুখে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাল্লাহ।

কুরআন ও হাদীছ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি নবী-রাসূলের যুগে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুব সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। এক্ষেত্রে শারয়ী বিধানেও যুব সমাজের উপর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। যৌবনকাল মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। তারুণ্য কারো বাঁধা মানতে চায় না। সে তার আপন গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। যৌবন যেমন গড়তে পারে, তেমনি ভাঙতেও জানে। নদীর দু'পাড়ে উঁচু বাঁধ না দিলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যেমন নদীর পানি দু'কূল প্লাবিত করে ফসলের ক্ষেতসহ বসতবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায়; যৌবন কালকে সুপথে নিয়ন্ত্রণ না করলে তেমনি যে কোন মুহূর্তে বিপথগামী হতে বাধ্য। সে কারণেই প্রত্যেক যুবককে সতর্ক করে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, কিয়ামতের কঠিনতম সময়ে সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে; যেদিন আল্লার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তার দ্বিতীয় নম্বরে বলা হচ্ছে شَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللهِ 'ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে যৌবনকে অতিবাহিত করেছে' *(বুখারী, মুসলিম)*। অপর এক হাদীছে নবী (ছাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত কোন আদম সন্তান এক পাও অগ্রসর হতে পারবে না। প্রথম হল--عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا اَفْنَاهُ 'তার বয়স, সে তা কোন কাজে ব্যয় করেছে। দ্বিতীয় হল- وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا اَبْلَاهُ 'তার যৌবনকাল, সে তা কোন পথে ব্যয় করেছে' *(তিরমিযী)*।

উল্লেখিত দু'টি হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ করে তার যৌবন কালের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবে দিতে হবে। আর শেষ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে গেলে সময় থাকতেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ করে যুব সমাজকে দায়িত্ব সচেতন হতে হবে। অন্যথায় সেদিন কঠিনভাবে অপমানিত হওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলা থাককে না। যার নিশ্চিত পরিণতি হল জাহান্নাম। এই চেতনাবোধ থেকেই বিগত দিনে জাহান্নামের ভয়ে ভীতু এবং জান্নাতের পাগল যুবসমাজ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মোহ ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিলিয়ে দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনি। কেননা তাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল মহান আল্লাহর অমীয় বাণী-'নিশ্চয়ই আল্লাহ জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন' *(তওবা ১১১)*।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের ভূমিকার কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথা। তিনি মুসলমান হওয়ার আগ পর্যন্ত নবী (ছাঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা অত্যন্ত সংগোপণে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। অন্যদের সাথে স্বয়ং ওমরও ছিলেন ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর

শত্রু। নাঙ্গা তরবারী নিয়ে যে ওমর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শিরোচ্ছেদ করতে পাগলের মত ছুটে চলেছেন, সেই ওমরই আল্লাহর অশেষ রহমতে যখন মুসলমান হয়ে গেলেন তখন থেকেই প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু হয়ে গেল। ওমর (রাঃ)সহ মোট চল্লিশ জনের ছোট্ট একটি মুসলিম কাফেলা মক্কার অলিতে-গলিতে মিছিল বের করল। উলঙ্গ তরবারী হাতে মিছিলের প্রথম কাতারে মহাবীর ওমর (রাঃ)। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তাকবীর 'আল্লাহু আকবর' ধ্বণীতে মক্কার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। কাবা প্রাঙ্গণে গিয়ে মিছিল শেষ হল। সকলে একসাথে ছালাত আদায় করলেন। ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ওমরকে দেখে কুরায়েশ যারপরনাই বিস্মিত-হতভম্ব হল। তাদের ক্রোধান্বিত অবস্থা দেখে ওমর (রাঃ) বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, 'সাবধান! কোন মুসলমানের কেশাগ্র স্পর্শ করলে ওমরের তরবারী আজ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে'। তাৎক্ষণিক তারা কিছু না করতে পারলেও কোন দিনই মক্কার কাফের-মুশরিকরা মুসলমানদেরকে সহজ ভাবে গ্রহণ করেনি। যার ফলে সংঘটিত হয় বদর,ওহুদ, খন্দকসহ অসংখ্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। এসব সমর ক্ষেত্রেও মুসলিম যুবসমাজই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, যুবসমাজের আত্মত্যাগ ছাড়া পৃথিবীতে কোন সত্য উদ্ঘাটন বা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলের গো-কুরবানীর কাহিনী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বনী ইসরাঈলের এক যুবক তার চাচার সম্পত্তির লোভে এবং চাচাতো বোনকে বিয়ে করার আশায় রাতের অন্ধকারে চাচাকে হত্যা করে মৃতদেহ অন্যের বাড়ির সামনে রেখে আসে। পরদিন সকলে যে বাড়ির সামনে লাশ পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে চাচাকে হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করে। এ নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায় তারা উভয় পক্ষ বিষয়টি মিমাংসার জন্য হযরত মুসা (আঃ) এর স্মরণাপন্ন হয়। তখন মূসা (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানান যে, তোমরা একটা গাভী কুরবানী করে তার এক টুকরো গোশত ঐ মৃত লাশের গায়ে স্পর্শ কর, তাহলে সে জীবিত হয়ে তার মৃত্যু-কাহিনী বর্ণনা করবে। তারা তখন মুসা (আঃ)-এর সাথে বহু বাদানুবাদ করল যেমন, গাভীটি কেমন হবে, তার রং কি, তার সয়স কেমন ইত্যাদি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন গাভীর যতগুলো গুণাগুন বর্ণনা করা হল তার প্রথমটি হল- 'গাভীটি বয়সে বৃদ্ধও হবে না আবার বাছুরও হবে না। এর মধ্যবর্তী যৌবন বয়সের হতে হবে' *(বাকারা ৬৮)*। অবশেষে তারা তাই করল। মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তার হত্যার রহস্য প্রকাশ করে দিল। দু'টি গোত্র সাক্ষাত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের হাত থেকে রক্ষা পেল। এখানে লক্ষণীয় যে, একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে কিছু মানুষকে নিষ্কৃতি প্রদানের অসীলা হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মধ্যম বয়সী প্রাণীকে নির্বাচন করা হল।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুব সমাজের আত্মত্যাগের গুরুত্ব আরো বেশী পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে 'আসহাবুল উখদূদ'-এর কাহিনীতে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এরূপ- পূর্ব জামানায় এক রাজা একটি ছেলেকে যাদুবিদ্যা শেখানোর জন্য তার বৃদ্ধ যাদুকরের কাছে পাঠায়। ছেলেটি যাদুবিদ্যা শিক্ষার পাশাপাশি এক খৃষ্টান পাদ্রীর নিকটে ছবক নিত। একদিন তার যাতায়াতের পথে বিরাট এক বন্য জন্তু এসে মানুষের চলাচলের পথ রুদ্ধ করে রাখল। ছেলেটি তখন ভাবল আজ আমি পরখ করে দেখব, পাদ্রী শ্রেষ্ঠ না যাদুকর শ্রেষ্ঠ? সে তখন একটি পাথর হাতে নিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! পাদ্রীর কর্ম যাদুকরের কর্ম হতে আপনার কাছে যদি অধিক পছন্দনীয় হয়, তবে এ জন্তুটিকে মেরে ফেলুন'। এই বলে সে পাথরটি নিক্ষেপ করল এবং ঐ পাথরের আঘাতে জন্তুটি মরে গেল। বিষয়টি সর্বত্র জানাজানি হয়ে গেল। তখন অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীসহ বিভিন্ন রোগীরা ছেলেটির কাছে আসতো। তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনলে সে তাদের রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকটে দো'আ করত তাদের রোগ ভাল হয়ে যেত। এক পর্যায় রাজার পরিষদের এক সদস্য অন্ধ ছেলেটির নিকটে গিয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, আল্লাহর রহমতে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। পরের দিন সে রাজ দরবারে গেলে রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, কে তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল? সে উত্তর দিল, আমার রব। রাজা বলল, আমি ছাড়া তোমার রব কে? সে বলল, আল্লাহ তোমার ও আমার রব। তখন রাজা তাকে গ্রেফতার করে অমানুষিক নির্যাতন করতে লাগল। অবশেষে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ছেলেটির কথা বলে দেয়। রাজা তখন ছেলেটিকে গ্রেফতার করে তাকেও নির্মমভাবে নির্যাতন শুরু করে। এক পর্যায় ছেলেটি বাধ্য হয়ে পাদ্রীর কথা রাজাকে বলে। রাজা তখন পাদ্রীকে গ্রেফতার করে আনে তার দ্বীন ত্যাগ করতে বলে। কিন্তু সে প্রস্তাবে পাদ্রী অস্বীকৃতি জানালে তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরে অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত করা হয়। এরপর তার পরিষদের লোকটিকে বলা হয়, তুমি তোমার দ্বীন ত্যাগ কর। সেও অস্বীকৃতি জানালে তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরে হত্যা করা হয়। অতঃপর একই ভাবে ছেলেটিও দ্বীন পরিত্যাগে অস্বীকৃতি জানালে তাকে কিছু সৈন্যের সাথে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় তুলে সেখান থেকে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে পাহাড় কেঁপে উঠে, এতে তার সঙ্গীরা পাহাড়ের চূড়া হতে নিচে পড়ে মারা যায় এবং ছেলেটি প্রাণে রক্ষা পায়। অতঃপর তাকে নৌকায় করে সাগরের মাঝখানে নিয়ে পানিতে ফেলে দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও যারা তাকে নিয়ে গেল ঝড়ের কারণে তাদের সলীল সমাধি হল, কিন্তু আল্লাহর রহমতে ছেলেটির কিছুই হল না। রাজার হতবিহবল অবস্থা দেখে ছেলেটি রাজাকে বলল, তুমি আমার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ না করলে আমাকে হত্যা করতে পারবে না। সে তখন রাজাকে বলল, একটি ময়দানে রাজ্যের সকল জনগণকে সমবেত কর। তাই করা হল। অতঃপর ছেলেটি বলল, এবার আমাকে শূলের উপর উঠাও এবং আমার তীরদানী হতে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মাঝখানে রেখে 'ছেলেটির রবের নামে তীর মারছি' বলে তীর নিক্ষেপ কর। তাই করা হল এবং ছেলেটি মারা গেল। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকল জনতা বলে উঠল, 'আমরা ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম'। যে আশঙ্কায় ভীত হয়ে রাজা পাদ্রীকে, পরিষদ সদস্যকে এবং এই ছেলেকে হত্যা করল; শেষ পর্যন্ত তাই বাস্তবায়িত হল।

রাজা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী এই মানুষগুলোকে ধরে ধরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারল।

সংক্ষেপে বর্ণিত এ ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, ছেলেটি একমাত্র দ্বীন প্রচারের খাতিরে স্বেচ্ছায় নিজের হত্যার কৌশল শত্রুর নিকটে ব্যক্ত করল। ফলে মাত্র একজন যুবকের আত্মত্যাগের বিনিময়ে হাযার হাযার মানুষ পরকালীন মুক্তির দিশা খুঁজে পেল। এমনিভাবে যুগে যুগে যুবসমাজের আত্মত্যাগের মাধ্যমে সমাজ থেকে অন্যায় ও অসত্যের দম্ভ চূর্ণ হয়ে তদস্থলে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

বর্তমান বিশ্ব পরিমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে সর্বত্র নব্য ফেরাউন ও নমরুদ মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করতে অক্টোপাসের মত ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলেছে। মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা তোহমত দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য জাতির কাছে তাদেরকে হেয় বা ঘৃণ্য জাতি হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। ইরাক, আফগান, কাশ্মীর, সোমালিয়াসহ বিশ্বের যেখানেই মুসলমানরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় এবং শোষণ, বঞ্চণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, সেখানেই তাদেরকে ইহুদী-খৃষ্টানদের মদদপুষ্ট প্রচার মাধ্যমগুলো জঙ্গী হিসেবে চিত্রিত করছে। অথচ তাদের মুখে কখনও ইসরাঈলকে জঙ্গী বলতে শোনা যায় না, শ্রীলংকার তামিল বিদ্রোহী, ভারতের উলফাসহ অন্যান্য চরমপন্থী গ্রুপগুলোকে, নেপালের মাওবাদী বিদ্রোহী বাহিনীসহ অন্য ধর্মাবলম্বী চরমপন্থী কোন গ্রুপকে জঙ্গী বলতে শোনা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এসব মোড়লদের বিরুদ্ধে ঐ সকল চরমপন্থী দলগুলোকে অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে সহযোগিতা করারও অভিযোগ ওঠে, যা বহুলাংশে সত্য। ইহুদী-খৃষ্টানদের এহেন ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মুসলিম যুবকদের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। যাতে কোন অবস্থাতেই কোন মুসলিম যুবক তাদের হাতের পুতুলে পরিণত না হয়।

সাম্প্রতিক কালে ধর্মের নামে অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত কিছু যুবক সস্তায় জান্নাত লাভের আশায় ইহূদী-নাছারাদের চক্রান্তের শিকার হয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে। বিশেষ করে কোমলমতি যুবসমাজকে জিহাদের নামে সরাসরি জঙ্গী কার্যক্রমের মত ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। কুরআন-হাদীছের খণ্ড খণ্ড আয়াত ও হাদীছ পড়িয়ে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে সরলমনা এসব ছেলেদের শরীরে বোমা বেঁধে ইসলামের দুশমন খতমের নামে যত্রতত্র হামলা চালানো হচ্ছে। আর তাতে প্রাণ হারাচ্ছে শত শত নিরীহ নিরপরাধ প্রাণ। পরিণামে ছেলেটি ইহকাল-পরকাল দুটিই হারাচ্ছে; সাথে সাথে বিশ্বের দরবারে চির সত্য ধর্ম ইসলাম সন্ত্রাসীদের ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত হচ্ছে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি হত্যার বিনিময়ে হত্যা অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কোন নিরপরাধ ব্যক্তি হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করল' *(মায়েদা ৩২)*। অতএব সাবধান হে যুবসমাজ! কোন চক্রান্তকারীর চক্রান্তের শিকার হয়ে আমরা যেন বিপথগামী না হয়ে পড়ি। সাথে সাথে মহান আল্লাহ আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা যেন যথাযথভাবে পালন করে যেতে পারি সেদিকে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। হে যুবক! সর্বদা স্মরণ রেখ রাসূলের বাণী। জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গনীমত মনে কর। যার প্রথম নম্বরটি হল 'তোমার বার্ধক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনকালকে' *(তিরমিযী)*।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাংলার পথভোলা যুবকদেরকে আল্লাহ্ প্রেরিত সর্বশেষ অহীর পথে পরিচালনার জন্য নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী একক যুবকাফেলা। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কুরআন ও হাদীছ গবেষণার মাধ্যমে নির্ধারিত পাঁচটি মূলনীতিকে সামনে রেখে যুগোপযোগী কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে এ সংগঠন বিচ্ছিন্ন যুব সমাজকে ইলাহী বিধানের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে তুচ্ছজ্ঞান করে জান্নাতমুখী হতে আহ্বান জানায়। এ সংগঠন মাযহাবী ফের্কাবন্দী ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধে উঠে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এক আল্লাহ্র বিধান মেনে নেওয়ার আহ্বান জানায়।

পরিশেষে যুব সমাজের প্রতি একান্ত নিবেদন, মহান আল্লাহ আমাদেরকে যৌবন নামক যে অমূল্য সম্পদ দান করেছেন, আমরা যেন তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করে পরকালে সগৌরবে জান্নাতী যুবকদের কাতারে শামিল হতে পারি সে চেষ্টা করে যেতে হবে। মহান আল্লাহ যেন আমাদের এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আমীন!!

ব্যক্তিত্ব গঠন

সবচেয়ে স্বার্থপর ১ অক্ষরের শব্দ-
'I' (আমি)
একে ত্যাগ করুন
সবচেয়ে পরিতুষ্টি ও সম্প্রীতিকর ২ অক্ষরের শব্দ-
'We' (আমরা)
একে ব্যবহার করুন
সবচেয়ে বিষাক্ত ৩ অক্ষরের শব্দ-
'go' (আত্মঅহমিকা)
একে ধ্বংস করুন
সর্বাধিক ব্যবহৃত ৪ অক্ষরের শব্দ-
'Love' (ভালবাসা)
একে মূল্য দিন
সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর ৫ অক্ষরের শব্দ-
'Smile' (স্মিতহাসি)
একে ধরে রাখুন
সর্বাধিক দ্রুত বিস্তৃতি লাভকারী ৬ অক্ষরের শব্দ-
'Rumour' (গুজব)
একে এড়িয়ে চলুন
সর্বাধিক পরিশ্রমনির্ভর ৭ অক্ষরের শব্দ-
'Success' (সাফল্য)
এটি অর্জনে ব্রতী হউন
সর্বাধিক হিংসাত্মক ৮ অক্ষরের শব্দ-
'Jealousy' (ঈর্ষা)
এটি থেকে দূরে থাকুন
সর্বাধিক শক্তিশালী ৯ অক্ষরের শব্দ-
'Knowledge' (জ্ঞান)
একে অর্জন করুন
সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ১০ অক্ষরের শব্দ-
'Confidence' (আত্মবিশ্বাস)
এটির ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হউন

আহলেহাদীছের পরিচয়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

আহলেহাদীছ কোন দল বা মতবাদের নাম নয়, এটি একটি আন্দোলন। এ আন্দোলন ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা এক নির্ভেজাল অবিমিশ্র পবিত্র আন্দোলন। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর বুকে ইসলামের দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়া ঠিক সেভাবে যেভাবে মহান আল্লাহ কর্তৃক এ দ্বীন নাযিল হয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে। সালাফে ছালেহীন তথা ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে' তাবেঈন ও তাঁদের অনুসারীদের সঠিক বুঝ অনুযায়ী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণের প্রতি দাওয়াত দানের উপর ভিত্তি করেই এ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত। এ আন্দোলন আক্বীদা-আমল, ইবাদত-বন্দেগী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কথা-কর্ম ও দিক-নির্দেশনায় সালাফে ছালেহীনের মাসলাক অনুযায়ী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই অনুসরণ করে এবং তাকে মানদণ্ড হিসাবে উপস্থাপন করে। মূলতঃ ইসলামের প্রতিটি হুকুম-আহকামকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার সাথে সাথে মানবসমাজে প্রচলিত যাবতীয় শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই তাদের আপোষহীন সংগ্রাম।

অন্যদিকে বৈশিষ্ট্যগতভাবে আহলেহাদীছ বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করে এবং দ্বীনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে কুরআন ও হাদীছের উপর নির্ভর করে। অতএব ইলমুল হাদীছ ও উছূলুল হাদীছে যার অগাধ জ্ঞান নেই অথচ কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী তিনিও আহলেহাদীছ হিসাবে পরিগণিত হবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হাদীছ ও ইলমুল হাদীছে পারদর্শী কিন্তু আক্বীদা-বিশ্বাস, জ্ঞান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে আহলেহাদীছের পরিপন্থী সে আহলেহাদীছ নয়। তবে যদি কেউ আহলেহাদীছদের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে তাহলে তাদের মত ছওয়াব ও সম্মান-মর্যাদা লাভ করবে। মোদ্দাকথা আহলেহাদীছ হচ্ছে সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী *(মুহাম্মাদ মুহিব্বুদ্দীন আবূ যুবায়ের, খাছাইছু আহলিল হাদীছ ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ১৮-১৯)*।

আহলেহাদীছের পরিচয় :

ফারসী সম্বন্ধ পদে 'আহলেহাদীছ' ও আরবী সম্বন্ধ পদে 'আহলুলহাদীছ' অর্থ 'হাদীছের অনুসারী'। প্রচলিত অর্থে কুরআন ও হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারীকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীক্বা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তিনিই এ নামে অভিহিত হবেন।

আহলেহাদীছগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন সমস্যার সমাধান তালাশ করেন এবং তাদের নিকটে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তারা সর্বপ্রথমেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। অর্থাৎ তারা সর্বাবস্থায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে সবার উপরে স্থান দিয়ে থাকেন।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) আহলেহাদীছের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'আহলেহাদীছ ওয়াস সুন্নাহ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত যাদের অন্ধভাবে অনুসরণীয় কোন ব্যক্তিত্ব নেই। তাঁরা রাসূলের কথা ও অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত এবং সেগুলির ছহীহ ও যঈফের পার্থক্য নিরূপণে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদানকারী, তাদের নেতৃবৃন্দও এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, এসবের (হাদীছের) অর্থ ও তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ। আর তারা বিশ্বাসে, কর্মে ও ভালবাসায় হাদীছের অনুসারী। যারা হাদীছকে ভালবাসে তাদের সাথে তারা বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আর যারা হাদীছের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে তাদেরকে শত্রু ভাবে' *(মাজমূ'আহ ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯৫)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'আমাদের নিকটে আহলেহাদীছ হলেন তারা যারা হাদীছের উপরে আমল করেন' *(ইবনু হাজার আসক্বালানী, আন-নুকাত আলা মুকাদ্দামা ইবনিছ ছালাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১-৫২)*।

আহলেহাদীছগণের পরিচয় দিতে গিয়ে Encyclopaedia of Islam-এ বলা হয়েছে, AHL-I-HADITH: The Followers of the prophetic traditions, who profess to hold the same as the early Ashab-al-hadith or Ahl-al-hadith (as opposed to Ahl-al-ray). They do not hold themselves bound by `Taqlid' ... but consider themselves free to seek guidance in mathers of religious faith and practices from the authentic traditions which together with the Quran are in their view the only worthy guide for the true muslims. The Ahle hadith try to go back to first principles and to restore the original simplicity and purity to faith and practices. 'আহলেহাদীছ বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুসারী দলকে বুঝায়। যারা প্রাথমিক যুগের আহলেহাদীছ বা আছহাবে হাদীছের ন্যায় মত পোষণ করে থাকেন (আহলুর রায়-এর বিপরীত)। যারা তাক্বলীদের বন্ধন স্বীকার করেন না। বরং স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই যথার্থ পথ প্রদর্শক বলে মনে করেন। আহলেহাদীছগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের নীতি সমূহের দিকে ফিরে যেতে চান এবং আক্বীদা ও আমলের মৌলিক সরলতা ও স্বচ্ছতাকে পুনরুদ্ধার করতে প্রচেষ্টা চালান'।

পণ্ডিত Titus Murray বলেন, Whatever the prophet Muhammad taught in the Quran and the authoritative Traditions (Ahadith Sahih), that alone is the basiss of the religion known as the Ahl-i-hadith. The tenets of the sect give clear exppression to the zeal which seeks to go back to first principles and to restore the original simplicity and sincerity of faith and practice. 'কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, একমাত্র তাকেই যারা ধর্মের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন, তারাই হলেন 'আহলেহাদীছ'। ইসলামের প্রথম যুগের মূলনীতির দিকে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে এবং

তার মৌলিক সরলতা, আক্বীদা ও আমলের স্বচ্ছতা পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়'।

বস্তুত আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; বরং যারা শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই জীবন চলার পথে দিক নির্দেশনা হিসাবে মেনে নেন এবং এতদুভয়ের আদেশ-নিষেধকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেন ও তদনুযায়ী আমল করেন তারাই আহলেহাদীছ বলে অভিহিত হবেন।

আহলেহাদীছ নামকরণের কারণ :

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডীন মুহিব্বুদ্দীন আবূ যুবায়ের বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ লাভ, ছহীহ ও যঈফের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ, ছহীহ-যঈফ অনুধাবন, হাদীছ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা এবং দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে হাদীছের উপর আমল করতে মনোনিবেশকরণ ও গুরুত্ব প্রদানের কারণে তাদের এ নাম রাখা হয়েছে' *(খাছাইছু আহলিল হাদীছ, পৃ. ১৭)*।

আল্লামা শাহরাস্তানী বলেন, 'তাদের নাম রাখা হয়েছে আহলুলহাদীছ। কেননা হাদীছ সংরক্ষণ ও সংকলনে তারা বিশেষ গুরুত্ব ও মনোযোগ দিয়ে থাকে, আহকাম বা বিধানের দলীলের উপর নির্ভর করে, খবর বা আছার পেলে তারা কিয়াসে জলী বা খফীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে না' *(ঐ, পৃ. ২০)*।

আল্লামা লালকাঈ বলেন, 'যারা এই আছারের উপর নির্ভর করে তারা সুন্নাতের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত, তারা আহলেহাদীছ নাম ধারণের অধিকতর উপযোগী, এ বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক হকদার এবং এ প্রতীকের জন্য বিশিষ্টতর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে তাদের বিশিষ্ট হওয়া, তাঁর কথার অনুসরণ, তাঁর সাহচর্যকে দীর্ঘায়িত করা, তাঁর ইলমকে প্রচার করা, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মকে সংরক্ষণ করার কারণে। তাঁর নিকট থেকে তারা ইসলামকে সরাসরি গ্রহণ করেছে, তাঁর শরী'আতকে প্রত্যক্ষভাবে ধারণ করেছে, তাঁর বিধি-বিধানকে পর্যবেক্ষণ করে কোন মাধ্যম ও মধ্যস্থতাকারী ব্যতিরেকে গ্রহণ করেছে। তারা হাদীছকে পর্যবেক্ষণ করে প্রচার করে, মৌখিকভাবে সংরক্ষণ করে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাসূলের নিকট থেকে দ্বীনকে লুফে নেয়, তাঁর যবানী থেকে লাভ করে এবং এর সবকিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। আর ঐসবকে আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে খালেছ অন্তরে গ্রহণ করে' *(ঐ, পৃ. ২০)*।

ইমাম ইসফারাইনী বলেন, 'উম্মতের মধ্যে তাদের চেয়ে রাসূলের হাদীছের অধিক অনুসারী এবং এদের চেয়ে বেশী তাঁর সুন্নাতের পাবন্দও কেউ নেই। একারণে তাদের নামকরণ করা হয়েছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' *(ঐ, পৃ. ২৩)*।

আহলেহাদীছদের নির্দশন :

আহলেহাদীছদের কিছু মূলনীতি আছে যার উপরে তারা চলে। অনুরূপ তাদের কিছু নির্দশনও আছে যার মাধ্যমে তাদের চেনা যায়। এখানে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় নিদর্শন উল্লেখ করা হলো।-

১. আহলেহাদীছগণ হাদীছ মানার স্বার্থে মানুষের কথা পরিহার করে। আর বিদ'আতীরা মানুষের উক্তির স্বার্থে হাদীছকে পরিত্যাগ করে।

২. আহলেহাদীছগণের নিকটে মানুষের বক্তব্য পেশ করা হ'লে যা হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল তা গ্রহণ করে। আর যা হাদীছের বিপরীত হয় তা বর্জন করে। পক্ষান্তরে বিদ'আতীদের নিকট মানুষের বক্তব্য পেশ করা হলে যা তাদের মতের সাথে মিলে যায় তা গ্রহণ করে, আর যা তাদের মতামতের বিপরীত হয় তা পরিহার করে।

৩. আহলেহাদীছদের নিকট রাসূলের ছহীহ হাদীছ উপস্থাপিত হলে তারা সে হাদীছের উপর আমল করা থেকে বিরত হয় না; বরং তার উপর কে আমল করছে বা কে বিরোধিতা করছে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে তারা ঐ হাদীছের উপর আমলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

৪. আহলেহাদীছগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত নির্দিষ্ট কোন উক্তি বা ব্যক্তির প্রতি সম্বন্ধিত হন না। সুতরাং তাদের এমন কোন উপাধি নেই, যা দ্বারা তারা পরিচিত হয় এবং কোন নিসবত নেই যার দিকে তারা সম্বন্ধিত হয়, কেবল আহলেহাদীছ ছাড়া। আর বিদ'আতীরা কখনো নির্দিষ্ট বক্তব্য, কাজ বা লোকের দিকে সম্বন্ধিত হয়। যেমন মুরজিয়া, কাদরিয়া, নাজ্জারিয়া, যাররাবিয়া, খারেজী, রাফেযী ইত্যাদি।

৫. আহলেহাদীছগণ ছহীহ হাদীছ এবং সালাফে ছালেহীনের আছারের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। আর বিদ'আতীরা তাদের নিজস্ব বক্তব্য ও মাযহাবের সহযোগী-সাহায্যকারী মাত্র।

৬. আহলেহাদীছগণ যখন হাদীছ উল্লেখ করেন এবং কেবল তার দিকেই মানুষকে আহ্বান করেন, তখন বিদ'আতীদের অন্তর তাকে ঘৃণা করে এবং তারা তা থেকে দূরে চলে যায়। ফলে তাদের অবস্থা হয় এরূপ যেমন আল্লাহ বলেন, 'যখন আপনি কুরআনে আপনার পালনকর্তার একত্ব পাঠ করেন, তখন অনীহাবশত ওরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়' *(বানী ইসরাঈল ৪৬)*।

আবার যখন বিদ'আতীদের নিকট তাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিদের কথা ও তাদের বাণী উল্লেখ করা হয়, তখন তারা আনন্দিত হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যখন খাঁটিভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে' *(যুমার ৪৫)*।

৭. আহলেহাদীছগণ হক্ব চিনে এবং তাঁরা সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহশীল। সুতরাং ইলমের খেদমত ও সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের সীমাহীন আন্তরিকতা রয়েছে। পক্ষান্তরে বিদ'আত পন্থীরা স্রষ্টাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও সৃষ্টিকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের জ্ঞান নেই এবং সৃষ্টির প্রতিও অনুগ্রহ নেই। আহলেহাদীছগণ তাদের কাছে দলীল উপস্থাপন করলে বিদ'আতপন্থীরা তাদের বন্দী ও হত্যা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

৮. আহলেহাদীছগণ তাদের নবীর সুন্নাতের প্রতি নমনীয় এবং সর্বক্ষেত্রে তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। আর বিদ'আতীরা তাদের অনুসরণীয় ইমামের বাণীর প্রতি নমনীয় ও তার প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়।

৯. আহলেহাদীছগণ কুরআন, হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরাম যে নীতির উপরে ছিলেন তাকেই তাদের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে এবং সকল সমস্যায় সেগুলি অনুযায়ী বিচার-ফয়ছালা করে। আর যারা এসবের বিরোধিতা করে তারা ফাসেকী ও কুফরী করছে বলে মনে করে।

১০. আহলেহাদীছগণের নিকটে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ বলেছেন ও আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন তখন তার কাছেই তাদের অন্তর থেমে যায়। আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূল ব্যতীত অন্যের দিকে ফিরে যায় না, কে কি বলল, তার দিকে দৃষ্টিপাতও করে না। কিন্তু বিদ'আতীরা তার ব্যতিক্রম।

১১. হাদীছ ছহীহ হোক বা যঈফ হোক যেটা বিদ'আতীদের মতামতের সাথে মিলে যায় সেটা তারা গ্রহণ করে। আর যেটা তাদের মতামতের সাথে মিলে না ছহীহ হাদীছ হলেও সেটাকে তারা পরিত্যাগ করে। যদি কোনভাবে তা প্রত্যাখ্যান করতে না পারে তাহলে বক্রভাবে অগ্রহণযোগ্য ও ঘৃণিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা থেকে দূরে থাকে, যাকে তাহরীফ বলা যায়। আর আহলেহাদীছগণের হাদীছের বিপরীতে নিজস্ব কোন মতামত নেই *(খাছাইছু আহলিল হাদীছ, পৃ. ২৭-২৯)*।

পরিশেষে আমরা বলব, আহলেহাদীছ একটি গুণবাচক নাম, একটি উপার্জিত বা অর্জিত উপাধি যা উম্মতে মুহাম্মাদীর ভূষণ সদৃশ। কর্মের সাথে, আমলের সাথে, ইচ্ছার সাথে, সাধনার পথে, চিন্তার স্রোতে ও চেতনার ব্রতে এ উপাধি মুমিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা মুসলমানের জন্য, ওয়াহদানিয়াতের জন্য, একতা-সংহতির জন্য উপার্জিত একটি নিখাদ, নির্ভেজাল গুণ। এগুণে গুণান্বিতদের রাসূলের যবানীতে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ইসলাম যে জীবন ব্রত, কল্যাণ ও নাজাতের স্রোত, তার মূল সত্তা তাওহীদ ও রিসালাত। আর তাওহীদ ও রিসালাতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ নিহিত আছে কুরআন ও সুন্নাহ্তে। সেই কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারীদের গুণবাচক নামই আহলেহাদীছ। মুসলমান, তাওহীদ ও রিসালাতের যে সতত আহ্বান তাই আহলেহাদীছের মুক্ত কণ্ঠের ডাক। আর কুরআন-সুন্নাহ্র অনুশাসনে যে জীবন, যে সাধনা, যে সংগ্রাম, যে আন্দোলন, যে আবেদন তাই আহলেহাদীছ। এই সতত প্রবাহমান কুরআন ও সুন্নাহ্র জীবন প্রতিষ্ঠাকামী আন্দোলন কোন ব্যক্তির আবির্ভাবের সাথে, যুগের সীমায় বা ভৌগলিক রেখায় সীমাবদ্ধ নয়। ইতিহাস আর ঐতিহ্যের স্বর্ণ সিড়ি বেয়ে এবং নাজাতের সোপান ধরে এ আন্দোলন মহানবী (ছাঃ)-এর নেতৃত্বে তাঁর জীবদ্দশা হতে শুরু করে অদ্যাবধি চলছে সারা দুনিয়ায় তাওহীদ ও সুন্নাহর বিজয়ী পতাকা নিয়ে। মাযহাবী বেড়াজালকে ছিন্ন করে বিভক্ত মুসলিম জাতিকে কুরআন ও হাদীছের কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধরূপে সমবেত করার প্রচেষ্টাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য।

মুসলিম জাতি আজ শতধা বিভক্ত। অথচ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যই আল-কুরআনের শাশ্বত আহ্বান। মুসলিম জনগণ আজ জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত। অথচ এই জাহেলী কর্মের বিরুদ্ধেই সমস্ত নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারী মনীষীবৃন্দের আপোষহীন সংগ্রাম। তাওহীদী শক্তির সেই চূড়ান্ত আদর্শ পরিত্যাগ ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত চিরন্তন হেদায়েতকে অগ্রাহ্য করার কারণেই মুসলিম জাতি আজ অপমানিত, ভাগ্যবিড়ম্বিত, দুর্দশাগ্রস্ত ও কুফরী শক্তির মুখাপেক্ষী। রাসূল বলেন, لَئِنْ أَنْتُمْ اتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَيُلْزِمَنَّكُمْ اللَّهُ مَذَلَّةً فِي أَعْنَاقِكُمْ ثُمَّ لَا تُنْزَعُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُونَ إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ وَتَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ – অর্থাৎ যদি তোমরা ঈনা বিক্রয় কর, ষাড়ের লেজ ধরে থাক এবং কৃষিকাজে লিপ্ত থাকার কারণে জিহাদ পরিত্যাগ কর, তবে আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান প্রবল করে দেবেন যে, যতক্ষণ না তোমরা দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তওবা করবে, ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদের থেকে ঐ অপমান দূর করবেন না *(আবু দাউদ, হা/৩০০৩; আহমাদ, হা/৫৩০৪)*।

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে সমস্ত মানব মণ্ডলীর নিকট পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নির্ভেজাল রূপে উপস্থিত করতে প্রতিটি মুসলিম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর এজন্য সবাইকে কুরআন ও সুন্নাহ্র নিঃশর্ত অনুসারী হ'তে হয়। আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক অর্থও তাই। ছহীহ হাদীছের উপর আমলের মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মুহাব্বাত করার মোক্ষম উপায়। আর ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার মধ্যেই কল্যাণ, মাগফিরাত ও নাজাত নিহিত। আহলেহাদীছগণ সেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবী (ছাঃ)-এর অমীয় বাণী ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার উদাত্ত আহ্বান জানায় দুনিয়ার মানুষকে।

ঈমান ও আক্বীদায়, ইবাদত-বন্দেগীতে এবং ইনসাফ ও ইহসানে উম্মতে মুহাম্মাদীকে পুরাপুরিভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ, নাজাত আর মাগফিরাত কামনা নিষ্ফল। তাই আসুন, সবাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রেযামন্দী হাছিলের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে তাক্বলীদে শাখছী পরিহার করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্বচ্ছ স্রোতধারায় একতাবদ্ধ হয়ে তাওহীদী কালিমার নাজাতী কাফেলা 'আহলেহাদীছে'র পতাকাতলে সমবেত হই। নিজেদের তৈরী দ্বন্দ্বমুখর তথাকথিত আদর্শিক সংকট পরিহার করে ও সর্বোতভাবে বর্জন করে 'উসওয়াতুন হাসানাহ' মহামানব ও বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর আদর্শকে অনুকরণ, অনুসরণ ও মনে প্রাণে লুফে নেই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও উহার বৈশিষ্ট্য

আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী

আহলেহাদীছ পরিচিতি :

আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে সর্ব প্রথম ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, 'আহলেহাদীছ' কোন মাযহাব বা ফির্কার নাম নহে। পৃথিবীতে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যা যতই অধিক হোক না কেন, সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, মাযহাব, দল, ফির্কা অথবা পার্টির আদর্শ ও কর্মসূচী ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক উদ্ভাসিত ও রূপায়িত হইয়াছে এবং উদ্ভাবক ও প্রতিষ্ঠাতাকে আশ্রয় করিয়াই উক্ত ফির্কা ও মাযহাবের উত্তরকালে বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটিয়াছে। রাজনৈতিক ও মাযহাবী ফির্কাবন্দীর ইতিহাসে ব্যক্তি বিশেষের কেন্দ্রত্ব ও প্রাধান্য এরূপ অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে যে, ফির্কা বা পার্টির অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও কর্মসূচীর অনুসরণের দিক দিয়া যতই অগ্রগণ্য হউক না কেন, ফির্কার ইমাম এবং পার্টির নেতার পুরাপুরি ভক্ত ও অনুগত না হওয়া পর্যন্ত তাহার নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার কোন মূল্যই স্বীকৃত হয় না। পক্ষান্তরে আদর্শ-নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা অপেক্ষা ফির্কাবন্দীর ইতিহাসে দলীয় নেতার আনুগত্য এবং অন্ধ অনুসরণ অর্থ্যাৎ তকলীদকেই অধিকতর মূল্যবান স্বীকার করা হইয়াছে। কালক্রমে দলপতির ভ্রম প্রমাদগুলির ফির্কা-পরস্তের দল একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকে এবং দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচীর সহিত দলপতির ব্যক্তিগত উক্তি ও আচরণের সংঘর্ষ ঘটিলে অন্ধ ভক্তের দল নেতার উক্তি ও আচরণকেই ঊর্ধ্বে স্থান দান করে। ইহার শেষ পরিণতি স্বরূপ আদর্শ ও কর্মের সমুদয় নিষ্ঠা ও তৎপরতার পরিবর্তে দলীয় অহমিকতা, গোঁড়ামী ও অনুদারতাই ফির্কার সমুদয় কার্যকলাপকে অধিকার করিয়া বসে।

একথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কোন ইমাম, দরবেশ অথবা কূটনীতি বিশারদকে আশ্রয় ও কেন্দ্র করিয়া 'আহালেহাদীছ আন্দোলনে'র ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই। বিভিন্ন ফির্কার অন্তর্ভুক্ত মুসলামানগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সার্বভৌম নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও কার্যতঃ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কোন না কোন ব্যক্তির নিজস্ব মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যাখ্যা অথবা আহলেহাদীছগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একচ্ছত্র নেতৃত্ব ব্যতীত উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কোন মহাপুরুষের উদ্ভাবিত আকীদা ও সিদ্ধান্তকে আহলেহাদীছগণের আকীদা এবং মাযহাবরূপে গ্রহণ করেন নাই। এমনকি সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্য হইতেও কোন মাননীয় পুরুষকে আহলেহাদীছগণ অভ্রান্ত ও মাসূম স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাকে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেন নাই। আহলেহাদীছগণ ছাহাবা, তাবেঈন, মহামতি ইমাম চতুষ্ঠয় এবং পরবর্তী যুগের সমুদয় মহামনীষী এবং বিদ্যারথীকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিলেও জ্ঞানের মুক্তি এবং যুক্তির স্বাধীনতাকে প্রলয়কাল পর্যন্ত সমুদয় যোগ্য এবং উপযুক্ত নরনারীর জন্য অবারিত রাখিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধিকে একমাত্র আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (ছাঃ) এবং উম্মতের সমুদয় বিদ্বানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন নেতা বা মহাপণ্ডিতের পদতলে সমর্পণ করিতে মুহূর্তের তরেও প্রস্তুত নহেন।

শুধু এইটুকুই নয়, আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূলনীতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অনুসারে আহলেহাদীছগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী ও ব্যবস্থাপক রূপে আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং মনুষ্যশ্রেণীর মধ্য হইতে শুধু তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য। যাঁহারা উল্লিখিত নীতি সমূহ মান্য করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের আহলেহাদীছ হইবার দাবীও তদ্রূপ অর্থহীন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা অন্যান্য দল ও ফির্কার সংঙ্গে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নামও এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আহলেহাদীছ মতবাদ ও উহার আন্দোলনের পটভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

আহলেহাদীছ মতবাদের কতিপয় প্রধান বৈশিষ্ট্য :

প্রথম বৈশিষ্ট্য : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সার্বভৌম অধিনায়কত্ব এবং তাঁহার হাদীছের সরাসরি অনুসরণ।

এরূপ প্রশ্ন কাহারো মনে উদিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র একচ্ছত্র আধিপত্য ও অধিনায়কত্ব প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠা করা কি শুধু আহলেহাদীছ আন্দোলনেরই বৈশিষ্ট্য? এই প্রশ্নের জওয়াবে আমরা সসম্মানে দৃঢ়তার সহিত এই কথাই বলব যে, বাস্তবিকই একমাত্র আহলেহাদীছগণই কুরআন ও সুন্নাহ্র বিজয় পতাকার ধারক ও বাহক! আহলেসুন্নাত ফির্কাগুলির সকলেই কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রাধান্য নীতিগতভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহাদের নেতা ইমামগণের সিদ্ধান্তগুলিই কার্যত: তাঁহাদের কাছে প্রকৃত অনুসরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যে দলের যিনি মাননীয় ইমাম, তাঁহার কোন উক্তি ও সিদ্ধান্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের পরিপন্থী হইলেও উক্ত ইমাম বা নেতার নামে যে দলটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশের সরাসরি অনুসরণের পরিবর্তে তাঁহাদের নেতার উক্তিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং নেতার সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হাদীছের পরোক্ষ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন এবং যেভাবেই হউক রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর হাদীছকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া স্বীয় নেতার সিদ্ধান্তের সহিত সুসামঞ্জস্য করিতে সচেষ্ট হইয়া থাকেন। অথচ একটি স্থানেও তাঁহারা তাঁহাদের নেতার সিদ্ধান্ত বর্জন করিয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হন না। পক্ষান্তরে নেতার পরিগৃহীত কোন হাদীছ তাহক্বীক্ব ক্ষেত্রে দুর্বল বা অপ্রমাণিত সাব্যস্ত হইলেও তাঁহারা উহা পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর বলিষ্ঠ ও প্রামাণ্য হাদীছ গ্রহণ করিতে চান না। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে নেতার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকেই ভিত্তি করিয়া তাঁহারা 'কিয়াস' বা উপমান পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন মাস'আলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন।

কিন্তু আহলেহাদীছ মতবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সার্বভৌম অধিনায়কত্ব এবং তাঁহার হাদীছের আনুগত্য চুল পরিমাণও অতিক্রম করিয়া যাওয়া আহলেহাদীছগণের নীতি বিরুদ্ধ। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মুকাবিলায় কোন মহাবিদ্বান, আইন শাস্ত্রবিদ ও শক্তিমান শাসনকর্তার উক্তি ও নির্দেশ মান্য করা আহলেহাদীছ আক্বীদা অনুসারে অবৈধ ও মহাপাপ। বলিষ্ঠতর হাদীছের সমকক্ষতায় দুর্বল হাদীছের অনুসরণ করা আহলেহাদীছগণের রীতি বিরুদ্ধ। আমাদের এই দাবীর অকাট্য প্রমাণ এই যে, পৃথিবীর সমুদয় মাযহাবী ফির্কা তাঁহাদের মাযহাবের মাসআলাগুলি বিশেষভাবে সঙ্কলিত করিয়া পৃথক পৃথক ফিকহ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি দল তাঁহাদের নিজেদের দলীয় মাসআলার গ্রন্থগুলিকে নিজেদের গ্রন্থরূপে এবং অপরাপর দলের মাসআলার পুস্তকগুলিকে ভিন্ন মাযহাবের কিতাবরূপে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত আহলেহাদীছগণের যেরূপ কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সর্বাধিনায়ক বা ইমাম নাই, সেইরূপ আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ গ্রন্থ ব্যতীত কোন বিদ্বান ও মহাপণ্ডিতের লিখিত পুস্তককে নিজেদের গ্রন্থরূপে স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের চয়ন, সঙ্কলন, সম্পাদন, ব্যাখ্যা ও আলোচনা ব্যতীত কোন ইমাম বা নেতার সিদ্ধান্তগুলিকে ভিত্তি করিয়া নতুন নতুন মাসআলা রচনা করার কার্যে কদাচ প্রবৃত্ত হন নাই।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সর্ব সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান।

এই মতবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার স্থিতি স্থাপকতা গুণ। বিভিন্ন ফির্কা ও দলের ন্যায় আহলেহাদীছ আন্দোলন মানব সমাজের নিত্য নতুন প্রয়োজন ও যুগধর্মের দাবীকে অস্বীকার করে না। যুগ বিশেষের কোন মানবীয় নেতৃত্ব, প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্তকে চরম ও অকাট্য বলিয়া স্বীকার না করায় এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া ইহার পরিপুষ্টি সাধিত না হওয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনে কুরআন ও সুন্নাহ্কে ভিত্তি করিয়া সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের যুগোপযোগী সমাধানের সকল সময়েই অবকাশ রহিয়াছে। প্রচলিত মাযহাব সমূহের কোন একটিতেও সকল যুগের সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের জওয়াব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গতানুগতিকতা ও ফির্কাবন্দীর প্রভাব অস্বীকার না করা পর্যন্ত ইসলামকে সর্বযুগোপযোগী শক্তিশালী জীবন ব্যবস্থারূপে প্রমাণিত করার কোন উপায় নাই। একমাত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনই এই রোগের প্রতিষেধক।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : আল্লাহ্র একত্ব ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুওতের চরমত্বের ভিত্তিতে মুসলিম জাতির সংহতি।

'আল্লাহ্র একত্ব এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্ব' এই মহা মতবাদকে ভিত্তি করিয়া মুসলিম সমাজের জাতীয় সংহতির গুরুত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অতীতে ও বর্তমানে দল, মত ও ফির্কার উগ্র প্রভাবেই মুসলিম সংহতির এই অত্যাবশ্যক মতবাদ ক্ষুণ্ন হইয়াছে। একমাত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনই বিশ্বের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মুসলিমকে নবুয়তে আলিংগনাবদ্ধ হইবার আহ্বান জানাইয়াছে।

আরো একটি বৈশিষ্ট্য :

আহলেহাদীছ আন্দোলনের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও ইহা দলীয় স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের আহ্বায়ক নয়, ইহা কখনো পৃথক কোন রাজনৈতিক গোঠ গঠন করিতে চায় না। দেশের এবং জাতির বৃহত্তর ও মহত্তর কল্যাণের জন্য সকল প্রকার ন্যায়ানুমোদিত আন্দোলনে মুসলিম জনগণের সহিত মিলিত হইয়া সমাজের অন্য দশ জনের ন্যায় কাজ করিয়া যাওয়াই ইহার পরিগৃহীত কর্মপন্থা। এই আন্দোলনের অনুসারীরা আইন সভায় রক্ষাকবচ বা স্বতন্ত্র আসনের দাবীদার হইতে পারে না, এমনকি দলগতভাবে তাহারা নিজেদের স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবীও উপস্থিত করে না। এই আন্দোলনের অনুসরণকারীগণের জন্য স্বতন্ত্র কোন কলোনী বা উপনিবেশের দাবীদার হইবার উপায় নাই। মুসলিম জনগণের সাধারণ স্বার্থই হইতেছে এই আন্দোলনের অনুসারীগণের স্বার্থ এবং জাতির পতাকাই হইতেছে ইহাদের একমাত্র পতাকা। দেশের সকল প্রকার রাজনীতিকে ইসলামী রূপ প্রদান করা এবং কুরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়িয়া তোলাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। খিলাফতে রাশিদার আদর্শে ইসলামী রাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবন সাধন আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্য।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের পটভূমি ও কর্মক্ষেত্র :

ফলকথা, আহলেহাদীছ নির্দিষ্ট কোন দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুতঃ ফির্কাবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই ইহার উত্থান হইয়াছে। কিন্তু কুরআন ও হাদীছের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা এবং জাতির পুনর্গঠন ও সংস্কারের কার্য এরূপ সুদূর প্রসারী ও শাখা-প্রশাখা বহুল যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীগণ সকল সময় সমবেতভাবে একই নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই।

গ্রন্থ রচনা :

বিগত উনবিংশ শতকে তাঁহাদের একদল ভারত উপমহাদেশে লেখনীর সাহায্যে কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং ইসলামের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বলিত সহস্র সহস্র গ্রন্থ ও সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও মুহাদ্দিছ নওয়াব সাইয়েদ সিদ্দীক হাসান খান, আল্লামা শামসুল হক আযিমাবাদী, মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা মোহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী, মাওলানা মুহীউদ্দীন লাহোরী, মওলানা বদীউয্যমান, মাওলানা ওয়াহীদুয্যামান প্রভৃতি বিদ্বানের নাম এই দলের পুরোভাগে অবস্থিত। নওয়াব সাইয়েদ সিদ্দীক হাসান এককভাবেই ক্ষুদ্র বৃহৎ পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই দলের তত্ত্বাবধানে 'শুহনায়ে হিন্দ' 'ইশাআস্সুন্নাহ,' যিয়াউস্ সুন্নাহ,' দিলগুদায পয়সা আখ্বার ও কর্জন গেজেট প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হইয়া ভারত উপমহাদেশে সাংবাদিকতার বীজ উপ্ত করে। উর্দূ সাহিত্যকেও আহলেহাদীছগণই ভারত উপমহাদেশে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব মুহসিনুল মুলক, মাওলানা হালী, ডেপুটি নযীর আহমদ, মুমিন খান শহীদ দেহলভী ও আব্দুল হালীম শরর প্রভৃতির নাম উর্দূ গদ্য ও কাব্য সাহিত্যে প্রলয়কাল পর্যন্ত অমর হইয়া রহিবে।

কুরআন ও হাদীছের অধ্যাপনা :

আহলেহাদীছগণের আর একটি দল তাঁহাদের সমস্ত জীবন শুধু কুরআন ও হাদীছের অধ্যাপনা কার্যেই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের অক্লান্ত সাধনার ফলেই পাক-ভারত ও বঙ্গ-আসামের ঘরে ঘরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছের পবিত্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, আল্লামা শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন আল-আনসারী, আল্লামা বশীর সহ্সওয়ানী, আল্লামা হাফিয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী প্রভৃতি এই দলের শীর্ষস্থানীয়।

তাবলীগে-দ্বীন :

আহলেহাদীছগণের আর একটি দল শির্ক ও বিদ'আতের প্রতিরোধকল্পে এবং তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনায় আকুল হইয়া কান্দাহার হইতে সিংহল পর্যন্ত এবং পোলের তরাই হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরবন পর্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া কে কোন স্থানে যে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করার উপায় নাই। সৈয়দ হাবীবুল্লাহ, সৈয়দ আব্দুল্লাহ গজনভী, সৈয়দ আব্দুল্লাহ ঝাউ, মওলানা ইবরাহীম নসীরাবাদী মুহাজিরে মক্কী, মাওলানা খাওয়াজা আহমদ নদীয়াভী, মাওলানা যিল্লুর রহীম মংগলকোটি, মাওলানা মনসুরুর রহমান ঢাকাভী, মাওলানা মীযানুর রহমান শ্রীহট্টী ও মাওলানা আব্দুল হাদী ইসলামাবাদী প্রভৃতির নাম এই দলের অগ্রভাগে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ :

আহলেহাদীছগণেরই আর একটি দল সংসারের মায়া এবং সুখ-শান্তির বুকে পদাঘাত করিয়া ভারত উপমহাদেশকে যুগপৎ ভাবে হিন্দু ও ইংরেজদের কবল ইহতে উদ্ধার করিয়া এই দেশে খেলাফতে রাশিদার শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন কল্পে নিষ্কাশিত তলওয়ার হস্তে সক্রিয়া সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। আল্লামা ইসমাইল শহীদ দেহলভী, সাদিকপুরের মাওলানা বেলায়াত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলী ভ্রাতৃযুগল, আল্লামা শাহ ইসহাক দেহলভীর জামাতা মাওলানা নসীরুদ্দীন শহীদ, ২৪ পরগনার মাওলানা ইবরাহীম আফতাব খান শহীদ প্রভৃতি বীর সেনানীর নাম এই দলেরঅধ্যক্ষরূপে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত রহিবে। ভারত উপমহাদেশকে বিজাতি, বিধর্মী ও বৈদেশিকদের কবল হইতে মুক্ত করার জন্য আহলেহাদীছগণ যে সক্রিয় সংগ্রাম অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পরিচালিত করিয়াছিলেন, ভারতের সিপাহীযুদ্ধ ও 'ওয়াহাবী বিদ্রোহের' কাহিনীর প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাকে তাহা রক্ত রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন।

মোটের উপর শতাব্দীর ঊর্ধ্বকাল ধরিয়া পাক ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, তামাদ্দুনিক ও সংস্কারমূলক আন্দোলন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে আহলেহাদীছগণ হয় কর্ণধার ও পথ-প্রদর্শক রূপে নেতৃত্ব করিয়াছেন, আর না হয় কুরআনের বিশ্ববিশ্রুত নীতি 'ন্যায়ের সাহচর্য ও অন্যায়ের প্রতিরোধ'-অনুসারে আহলেহাদীছগণ সেগুলির সহিত সহযোগের হস্ত মিলাইয়া আসিয়াছেন।

[লেখকের 'আহলে-হাদীস আন্দোলন ও উহার বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক পুস্তিকা থেকে সংকলিত ও আধুনিক বানানরীতির সাথে সমন্বয়কৃত]

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলনে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ

*

১৮.০১.১৯৮৬ শুক্রবার রাজশাহী শহরস্থ রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ১ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সংগঠনের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। ভাষণটির সারাংশ পরে 'তাওহীদের ডাক' প্রথম সংখ্যায় (জানু-ফেব্রু'৮৬) প্রকাশিত হয়। গুরুত্ব বিবেচনায় অত্র ভাষণটি পুণঃমুদ্রিত হল

*

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ১ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলনে আগত দেশের বিভিন্ন এলাকার নিবেদিতপ্রাণ মর্দে মুজাহিদ বন্ধুগণ!

আজ যে যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য রাখতে চাচ্ছি, আসুন প্রথমে আমরা সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করি। কেননা সমস্যা চিহ্নিত করতে না পারলে সমাধান বের করা মোটেই সম্ভব নয়।

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ধর্ম ও বস্তুবাদ বর্তমানে আমাদের দেশে প্রবল স্নায়ুযুদ্ধে লিপ্ত। ১৩শ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মুখোমুখি সংঘর্ষের পর থেকে বস্তুবাদ বিভিন্ন বেশে বিভিন্ন মতাদর্শের লোকদের মধ্যে ঢুকে পড়তে শুরু করে। পরে ইংলাণ্ডের হব্‌স, লক, ফ্রান্সের ভল্টেয়ার, রুশো, মন্টেস্কু ধর্মের বিরুদ্ধবাদী চেতনায় বারি সিঞ্চন করেন। তার কিছু পরে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসে। যদিও ডারউইনের আমলেই বিজ্ঞানীগণ এই মতবাদকে পুরোপুরি কেউই গ্রহণ করতে সম্মত হননি। এমনকি হ্যাক্সলের মত গোঁড়া সমর্থক পর্যন্তও এতে বিশ্বাস স্থাপন করেননি। তবুও 'গোটা বিশ্বপ্রকৃতি কোন অতি প্রাকৃতিক শক্তির সহায়তা ছাড়াই আপনা আপনি চলছে'- বিজ্ঞানীদের আবেগভিত্তিক এই অযৌক্তিক দাবীর সমর্থক হওয়ায় এরা সবাই চোখ বুঁজে ডারউইনবাদকে সর্মথন করলেন। ফলে ইউরোপীয় ধর্মবাদীরা এই বৈজ্ঞানিক নাস্তিকতার স্রোতের সামনে এতখানি নতজানু হয়ে পড়েন যে, ১৮৮২ সালে ডারউইন মৃত্যুবরণ করলে ইংল্যাণ্ডের চার্চ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেন। তাঁকে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবীতে সমাহিত করার অনুমতি দেন। খৃষ্টান ধর্ম নেতাদের এই পরাজিত মানসিকতা ইউরোপের মাটিতে নাস্তিক্যবাদের শিকড় গাড়তে সাহায্য করে এবং এই আল্লাহ বিরোধী চিন্তাধারাই সেখানে ফ্যাসিবাদ ও বলশেভিকবাদ বিকাশের সুযোগ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ, ইংল্যাণ্ডের Glorious revolution প্রভৃতি ধর্মবিরোধী মনোভাবকে আরও মযবুত করে দেয় এবং বস্তুবাদই হয়ে পড়ে যাবতীয় চিন্তা-গবেষণার বিষয়বস্তু।

উনবিংশ শতাব্দীতে এসে এই ধর্মবিরোধী প্রবণতা দু'টি স্বতন্ত্র ধারায় অগ্রসর হ'তে শুরু করে। ১ম- ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্র হতে জীবনকে বস্তুবাদের সর্বাত্মক ধারণার অধীন করে দেওয়া অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্র হ'তে ধর্মকে নির্বাসন দেওয়া। এই দলের নেতৃত্ব ছিল দ্বিমুখী- (ক) ধর্মতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এই দলের নেতা ছিলেন গাফলুক, ডঃ ওয়াটসন, গেষ্টাউলফ, ফয়েরবাখ প্রমুখ এবং (খ) রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ছিল কার্লমার্কস, এঙ্গেলস ও তাদের অনুসারীদের হাতে।

২য় ধারাটি ছিল- ধর্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ Frontal attack বা সম্মুখ হামলা না চালিয়ে কেবল ক্ষমতার আসন থেকে বিতাড়িত করলেই যথেষ্ট হবে। কেননা জীবনের বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ থেকে জনগণ যখন ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হবে, তখন গৃহের ক্ষুদ্র পরিসর হ'তেও আস্তে আস্তে ধর্ম বিদায় নেবে। কিন্তু যদি উহাকে সম্মুখ হামলা করা হয় তাহলে ধর্মের প্রতি লোকদের স্বাভাবিক প্রবণতা তীব্র হয়ে উঠতে পারে। আর তা হবে এক মারাত্মক ভুল। এই অভিনব হেকমতি সন্দেশের Secularism ১৮৩২ সালে একটি আন্দোলনে রূপ নেয়। জেকব হালেক, চার্লস সাউথওয়েল, থমাস কুপার, থমাস টিয়ারসন, স্যার ব্রেডলে প্রমুখ ছিলেন এই আন্দোলনের নায়ক।

বর্তমান বিশ্বে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে প্রথমোক্ত মতবাদ ও অকম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র সমূহে দ্বিতীয় মতবাদের অনুশীলন চলছে। আসলে কম্যুনিজম, সেক্যুলারিজম উভয়ে একই ধর্মবিরোধী বস্তুবাদী ভাবধারা হ'তে উদ্ভূত। উভয়েরই শেষ লক্ষ্য ধর্মকে মানুষের জীবন হ'তে নির্বাসন দেওয়া। বাংলাদেশে কম্যুনিষ্ট ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দুই পরাশক্তির যৌথ মহড়া চলছে। কখনো তারা আপোষে লড়ছে বটে, কিন্তু ইসলামকে ঘায়েল করার ব্যাপারে তারা বিশ্বের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলাদেশেও একমত হয়ে কাজ করছে।

অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয় বলে বুঝাতে চান। এমনকি এর পক্ষে তারা কুরআনের অতি পরিচিত কয়েকটি আয়াতখণ্ডকেও ব্যবহার করেন। আসলে এদেশে যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দলভুক্ত, তাদের সাধারণ সমর্থকরা তো বটেই, নেতাদের মধ্যেও অনেকে হয়তো জানেন না যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম সরাসরি সংঘর্ষশীল। বরং আমরা মনে করি কতকগুলো ধূর্ত ব্যক্তি বস্তুবাদের আন্তর্জাতিক মোড়লদের ইঙ্গিতে এদেশের সাধারণ ভোটারদেরকে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। দেশের ইয্যত, জাতির ঈমান ও নৈতিকতার চাইতে নিজ দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করাই এদের প্রধান লক্ষ্য।

আগেই বলেছি সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দু'টিই বস্তুবাদ নামক বিষবৃক্ষের ফল। এক্ষণে আমরা দেখাতে চাইব-এ দু'টি বহুল প্রচারিত মতবাদের সঙ্গে ইসলামের সংঘর্ষের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলি কি কি? কম্যুনিজম ও সোশিয়ালিজম নিয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এ দু'টি মতাদর্শ সামাজিক ও ব্যক্তিগত কোন ক্ষেত্রেই ধর্মকে সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। যদিও কম্যুনিজমের চাইতে সোশিয়ালিজম এক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয়। গোল বেঁধেছে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিয়ে। ধর্মনিরপেক্ষ লোকেরা ধর্মীয় নাম রেখে ও মাঝে মাঝে নামায-রোযা করে দিব্যি ভেবে নেন যে, তিনি ইসলামের আর কি-ইবা বাকী রাখলেন। আমেরিকার লোকেরা ঘটা করে বড়দিন পালন করছে, আমরা ঘটা করে শবেবরাত ও মীলাদুন্নবী করছি, তাহ'লে আমরা কেমন করে ধর্মবিরোধী হলাম?

বন্ধুগণ! ইসলামের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংঘর্ষের প্রধান ক্ষেত্র হ'ল ৩টি। ১-ইসলামের মতে ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক তথা মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত এতে রয়েছে। পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতার মতে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাইরে সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে ধর্মের কোন আবশ্যকতা নেই।

২- ইসলামের মতে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হলেন আল্লাহ। আইন ও বিধানদাতাও তিনি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সেই আইনেরই বাস্তবায়ন করবে মাত্র। অন্যকিছুই যোগ-বিয়োগ করার ক্ষমতা তাদের নেই। রাষ্ট্রপ্রধান হ'তে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলেই আল্লাহ্‌র গোলাম। সকলেই তাঁর আইনের অনুগত।

পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতার মতে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সেই সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করার অধিকারী। তারাই খুশী মত আইন ও সংবিধান রচনা করবে। পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন কিংবা স্থগিত বা বাতিল করার একমাত্র হক্বদার তারাই। এখানে আল্লাহর আইনের প্রবেশাধিকার নেই। ফলে পার্লামেন্টের রায় আল্লাহ্‌র আইনের বিরোধী হ'লেও সেটা তাদের দৃষ্টিতে কোন অন্যায় নয়। কেননা এগুলো বৈষয়িক ব্যাপার।

৩-ইসলামের মতে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড হল আল্লাহ্র অহি। ধর্মনিরপেক্ষতার মতে ঐ মাপকাঠি হল মানুষের জ্ঞান। দল বা দলীয় নেতার সিদ্ধান্ত, General will –এর নামে Party will বা পার্লামেন্টের রায়ই ন্যায়-অন্যায় নির্ধারক মাপকাঠি।

পরিণতি : এইভাবে সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব ও পরকালীন জওয়াবদিহির অনুভূতি হ'তে মুক্ত হওয়ার ফলে পরিণতি এই দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ হক্ব না-হক্ব, সত্য-মিথ্যার সঠিক মানদণ্ড লাভ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। হেদায়েতের আলো প্রজ্জ্বলিত হওয়া সত্ত্বেও এই সকল বস্তুবাদী চিন্তাধারার ঘন কুয়াশায় মানুষ তা থেকে আলো নিতে পারছে না। বন্ধুগণ! হেদায়াতের সেই অনির্বাণ দীপশিখা কি? একটু পরেই আমরা সে আলোচনায় আসছি।

এতক্ষণ ধর্ম ও বস্তুবাদের সংঘর্ষের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, ঐতিহাসিকদের নিকট তা মাত্র ছয়শত বৎসরের ইতিহাস হ'লেও কুরআন পাঠকদের নিকট এই ইতিহাসে কোন নুতনত্ব নেই। বরং পৃথিবীতে মানুষের আগমনের প্রথম থেকেই সত্য ও মিথ্যার এই দ্বন্দ্ব চলে আসছে। যুগে যুগে প্রেরিত নবীগণ সত্যের মশাল নিয়ে এগিয়ে গেছেন। আর বাতিলের শিখণ্ডীগণ তাদের রাষ্ট্রীয়, সামরিক, অর্থনৈতিক তথা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই ধনী ও গরীবের দ্বন্দ্ব নয় বরং হক্ব ও বাতিলের দ্বন্দ্বই মানবজীবনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব।

পৃথিবীতে মানুষের আগমনের প্রথম থেকেই সত্য ও মিথ্যার এই দ্বন্দ্ব চলে আসছে। যুগে যুগে প্রেরিত নবীগণ সত্যের মশাল নিয়ে এগিয়ে গেছেন। আর বাতিলের শিখণ্ডীগণ তাদের রাষ্ট্রীয়, সামরিক, অর্থনৈতিক তথা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই ধনী ও গরীবের দ্বন্দ্ব নয় বরং হক্ব ও বাতিলের দ্বন্দ্বই মানবজীবনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব।

নবীদের আগমনের সিলসিলা সমাপ্ত ও পূর্ণত্ব লাভ করেছে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (ছাঃ)-এর আগমনে। কুরআনী অহির বাস্তব রূপকার নবী মুস্তফার শরীয়ত সংক্রান্ত সকল কথা, কাজ ও সম্মতিমূলক আচরণ সবই ছিল অহি নির্দেশিত। যা শরীয়তের পরিভাষায় হাদীছ বা সুন্নাহ নামে অভিহিত। নবীর মৃত্যু হয়ে গেছে। রেখে গিয়েছেন আমাদের নিকট কিতাব ও সুন্নাতের পবিত্র আমানত। এক্ষণে মুসলিম হিসাবে আমাদের প্রধান কর্তব্য কিতাব ও সুন্নাতের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষকে অভ্রান্ত হেদায়েতের দিকে দা'ওয়াত দেওয়া। এবং এভাবে আল্লাহ্র দ্বীনকে দুনিয়ার অন্যান্য সকল মতাদর্শের উপর বিজয়ী করার প্রচেষ্টায় নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করা।

আহলেহাদীছ আন্দোলন

বন্ধুগণ! রাসূলের রেখে যাওয়া উক্ত আমানতের যথাযথ মূল্যায়ন ও অনুসরণের ফলে খেলাফতে রাশেদার ৩০ বৎসরের শাসনামলে দুনিয়ার মুসলিম এলাকায় এক অতুলনীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক ইহুদী চক্রান্ত ও খৃষ্টানী তৎপরতার ফলে মুসলিম জনগণের মধ্যে আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে এক বড় রকমের বিপর্যয় দেখা দেয়। রাসূলের জীবদ্দশাতেই মুনাফিকদের আচরণে এটার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল এবং খেলাফতে রাশেদার আমলে এদের চক্রান্তের ফলে মর্মান্তিক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটেছিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক বস্তুবাদী দর্শনের কুটতর্কে মুসলমানদেরকে জড়িয়ে ফেলা হয়। বলা বাহুল্য এই সব চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জনগণকে কুরআন ও সুন্নাহর মূল উৎস হ'তে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেওয়া।

মুসলিম বাতিলপন্থীদের এই আচরণ লক্ষ্য করে ছাহাবায়ে কেরাম ও হক্বপন্থী মুসলিমগণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' শুরু করেন এবং মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহ্র মূল উৎসে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানাতে থাকেন। প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) মুসলিম যুবকদের দেখলে খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠতেন 'রাসূলের অছিয়ত অনুযায়ী তোমরা আমার মুবারকবাদ গ্রহণ কর। ...কেননা তোমরাই আমাদের উত্তরসূরী ও আমাদের পরবর্তী আহলুলহাদীছ' *(হাকেম-১৮৮)*। বুঝা গেল সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম 'আহলুলহাদীছ' ও 'মুসলিম' দুই নামেই কথিত হতেন। খেলাফতে রাশেদার আমলে বিজিত দুনিয়ার সকল এলাকার সকল মুসলমান আহলেহাদীছ নামেই অভিহিত ছিলেন। যদিও মুসলিম নামধারী বিদ'আতী তথা বাতিলপন্থীদের অস্তিত্ব সকল যুগেই ছিল। চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে তাকলীদে শাখ্ছী তথা ইমামদের প্রতি অন্ধ অনুকরণের বিদ'আত চালু হওয়ার প্রাক্কালেও ভারতে মুসলমানদের অধিকাংশই আহলেহাদীছ ছিলেন *(আহসান-৩৮৫)*। কিন্তু চতুর্থ হিজরীতে তাকলীদে শাখছী মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তার ঢেউ ভারতেও আসে। ফলে আগে থেকেই মানুষ পূজায় অভ্যস্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের নওমুসলিমরা অনেকেই তাকলীদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং নিজেদের বহুদিনের আচরিত বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ ইসলামী রূপ দিয়ে ইসলামী অনুষ্ঠান হিসাবে সমাজে চালু করে দেয়। মানুষের স্বভাবজাত অনুকরণপ্রবণতা ও অনুষ্ঠানপ্রিয়তাই মুসলামানদেরকে তাকলীদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মুসলমান ইসলামের নামে বিভিন্ন অনৈসলামী ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হতে থাকে। আনুগত্যের নামে তারা বিভিন্ন পীর-দরবেশের কথা ও কাজের অন্ধ অনুসরণ করতে থাকে। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকা গড়ে উঠে। প্রত্যেক মাযহাবের ইমাম ও তরীকার পীরগণ সত্যের মানদণ্ড হিসাবে গণ্য হতে থাকেন। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের ইচ্ছামত ফৎওয়া চালু করে বিগত কোন বুযুর্গ ইমামের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। ইহুদী-নাছারা সমাজ যে তাকলীদে শাখছীর কারণে আল্লাহ্র গযবের শিকার হয়েছে। মুসলমানগণও সেই তাকলীদী জাহেলিয়াতকে বরণ করে নিল। ফলে বস্তুবাদীদের ধারণায় মানুষের জ্ঞানই যেমন সত্যের মানদণ্ড, তাকলীদপন্থীদের নিকট তেমনি ইমাম বা পীরের ফৎওয়াই হয়ে দাঁড়াল সত্যের মানদণ্ড; কুরআন বা সুন্নাহ নয়। শুধু তাই নয় তাকলীদপন্থীগণ নিজেদের রচিত বিদ'আতগুলিকে সপ্রমাণ করার জন্য জাল বা যঈফ হাদীছের আশ্রয় নিতেও কছুর করেনি। সবচাইতে বড় ক্ষতি এর দ্বারা যেটা হয়েছে, সেটা হল মুসলমানদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর মূল উৎস হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ইমাম ও পীর উপাধিধারী কতক মানুষের আনুগত্য শৃংখলে আবদ্ধ করেছে। যদিও কুরআন ও হাদীছের আদেশ-নিষেধের সম্মুখে কারও কথার কোন মূল্য নেই।

তাকলীদের দ্বিতীয় ফল হল এই যে, প্রত্যেক মাযহাবের লোকেরা নিজেদের মনগড়া মাযহাবকেই অভ্রান্ত সত্য ভাবতে শুরু করল এবং অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব সৃষ্টি হলো। অতিভক্তি ও অতি বিদ্বেষের ফলে শুরু হল পারস্পরিক হানাহানি। ধ্বংস হল বাগদাদ, মারভ, নিশাপুর। ঐক্য খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল চার মুছাল্লাহ নামে ঐক্যের মূর্ত প্রতীক কা'বাঘরের শান্ত চত্বরে। পাক-ভারত বাংলাদেশের সর্বত্র এমনকি মসজিদেও একত্রে ছালাত আদায় আর সম্ভব থাকল না। পারস্পরিক বিয়ে-শাদী, সালাম-কালাম পর্যন্ত নিষিদ্ধ হল। কমবেশী যার রেশ এখনও সমাজে চলছে।

বন্ধুগণ! উপরোক্ত তাকলীদী ফের্কাবন্দী ও দলাদলির জোয়ারে যখন সবাই ভেসে চলেছে, তখন পূর্বের ন্যায় একদল মুসলিম বিদ্বান সব সময়ই এর বিরোধিতা করে এসেছেন। তাঁরা সব সময়ই মুসলিম জনসাধারণকে কুরআন ও সুন্নাহর মূলকেন্দ্রে ফিরে যাওয়ার ও সেখান থেকে সরাসরি আলো নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আহলে বিদ'আত ও আহলে রায়দের বিরুদ্ধে তারা নিজেদের জন্য পূর্বের ন্যায় আহলুলহাদীছ নাম বজায় রাখেন। হাযারো বাধা বিঘ্নের মধ্যেও তারা

দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকেন। শাহ অলিউল্লাহ পরিবার, শাহ ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী, মিয়া নাযীর হোসায়েন দেহলভী, নওয়াব ছিদ্দিক হাসান খান ভূপালী, আবুল কাসেম বেনারসী, মুহাম্মাদ হোসায়েন বাটালভী, হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, ইসমাঈল গুজরানওয়ালা, শামসুল হক আযীমাবাদী, ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, আব্বাস আলী, বাবর আলী, আব্দুল্লাহিল কাফী প্রমুখের নাম আমরা এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি। বন্ধুগণ! এঁরা সবাই ছিলেন জাতির মুক্তির দিশারী ! এঁরা সবাই চেয়েছিলেন পূর্বের ন্যায় একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম শক্তি ভারতে আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠুক। এঁরা কেউই সরাসরি রাজনীতিতে অবতীর্ণ হননি। দূর থেকে রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছেন। কিন্তু কেন এই নিরাপদ অবস্থান?

সেটার কারণ ছিল বৃটিশের ভেদ-বুদ্ধির রাজনীতি। Divide and rule-এর ভেদনীতির ফলে মুসলমান গণতন্ত্রের ধোঁকায় পড়ে রাজনীতির নামে দলীয় কোন্দলে লিপ্ত হয়। বৃটিশ চলে গেছে। কিন্তু তাদের সেই নীতি আমাদের উপরে পুরো মাত্রায় সওয়ার হয়ে আছে। রাজনীতির নামে আজ এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বুকে ছুরি মারছে।

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা

বন্ধুগণ! ইতিপূর্বে যে অবস্থার কথা আমরা আলোচনা করে এসেছি, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা তার চাইতে আরও নাযুক বলা যেতে পারে। মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এখানে দুই ভাবে কাজ করছে। **এক**-পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের মুরব্বীরা এদেশের তরুণদের একটি দলকে বস্তুবাদের দীক্ষা দিচ্ছে। একাজে মুসলমানদের মধ্য হতেই কিছু রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীকে তারা বাছাই করে নিয়েছে। অথবা এরাই নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তাদের গোলামী বরণ করে নিয়েছে। **দুই**-ইসলামের নামে যারা রাজনীতি করছেন তারাও নিজ নিজ দলীয় অহমিকা বজায় রাখতে গিয়ে সাড়ে পাঁচ ডজন দলে বিভক্ত হয়েছেন। এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবার ঘুটি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছেন। ইসলামের স্বার্থ নয়, বরং দলীয় স্বার্থই এদের নিকট বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু এতেই শেষ নয় বরং মধ্য যুগে গ্রীক দর্শন সঞ্জাত কুটতর্কের ন্যায় 'রাজনীতি হ'তে ধর্ম পৃথক' এমন একটা অনৈসলামী থিওরীর প্রচারে আমাদেরই একদল ভাইকে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাঁরাই সমাজে প্রকৃত দ্বীনদার নামে খ্যাত হচ্ছেন।

এদেশে যাঁরা ইসলামী রাজনীতি করছেন, তাঁরা তাঁদের ভূমিকাতে স্পষ্ট নন। তার কারণ তাঁরা মঞ্চে-মিছিলে কুরআন ও সুন্নাহর বৈজয়ন্তী ঘোষণা করলেও ব্যক্তি জীবনে তাঁদের অধিকাংশই বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার অনুসারী। যে অনৈসলামী গণতন্ত্রের বরকতে (?) তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হাছিলের স্বপ্ন দেখেছেন, সে গণতন্ত্রে জনগণই খোদা। সংখ্যাগুরুর অত্যাচার সেখানে থাকবেই। তাই কুরআন ও সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ অনুসারী হিসাবে যারা দাবী করেন, তাদের পক্ষে এই দাপট নীরবে হযম করা কোনকালেই সম্ভব হবে না। কুরআন ও হাদীছ দুনিয়ায় বহাল তবিয়তে বর্তমান থাকতে ইসলামের নামে কোন নির্দিষ্ট একটি তাকলীদী মতবাদ জাতির স্কন্ধে চেপে বসুক এটা কখনোই তারা বরদাশ্ত করবে না।

বন্ধুগণ! ৬৬টি ইসলামিক পার্টির মধ্যে আমরাও একটি ভোটপ্রার্থী পার্টি হয়ে বিভক্তির কাতার আর বাড়াতে চাইনা। আমরা নিজেরা প্রার্থী না হয়ে মুসলিম ঐক্যের পক্ষে বলতে পারেন একটি Pressure group হিসাবে কাজ করতে চাই। আমরা উদারভাবে সকল মুসলমানকে কুরআন ও সুন্নাহর সার্বভৌম অধিকার নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে এক ও ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরমে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানাই। আমরা রাজনীতির নামে, ধর্মের নামে, তরীকার নামে, মাযহাবের নামে, পীর-মুরীদির ভাগাভাগির নামে আপোষে ভেদাভেদের বিরোধী। আমরা চাই মসজিদ হ'তে বঙ্গভবন পর্যন্ত সর্বত্র আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও রাসূলের নিরংকুশ নেতৃত্ব কায়েম হৌক। মানুষের বানানো কিয়াসী মাযহাব বা কোন ইজম নয়, বরং কুরআন ও সুন্নাহ হৌক সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান ও ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র মাপকাঠি।

আমরা উদারভাবে সকল মুসলমানকে কুরআন ও সুন্নাহর সার্বভৌম অধিকার নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে এক ও ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরমে জমায়েত হওয়ার আহবান জানাই। আমরা রাজনীতির নামে, ধর্মের নামে, তরীকার নামে, মযহাবের নামে, পীর-মুরীদির ভাগাভাগির নামে আপোষে ভেদাভেদের বিরোধী। আমরা চাই মসজিদ হ'তে বঙ্গভবন পর্যন্ত সর্বত্র আল্লাহ্র প্রভূত্ব ও রাসূলের নিরংকুশ নেতৃত্ব কায়েম হৌক।

যুবসমাজ

এদেশের যুবসমাজ রাজনৈতিক নেতাদের লোভনীয় শিকার। যৌবনের উদ্দীপনাকে বিভিন্ন রাজনীতির বলি হিসাবে এদেশে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রত্যেক পার্টি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এদেরকে শহীদ ও গাযী হিসাবে আখ্যায়িত করছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন থিওরীর চাকচিক্যে এদের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা বিভ্রান্ত হচ্ছে।

যুবসমাজকে ঐ সকল থিওরীর বেড়াজাল হ'তে মুক্ত করে কুরআন ও হাদীছের অভ্রান্ত সত্যের দিকে দা'ওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যেই জন্ম নিয়েছে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকাতে। আহলেহাদীছ নাম শুনেই আঁৎকে উঠবার কোন কারণ নেই। এটা কোন সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নয়। বরং রায় ও বিদ'আতপন্থীদের থেকে নিজেদের বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য বুঝানোর জন্যেই ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় আমরা এ নামে নিজেদেরকে পরিচিত করতে গর্ববোধ করি। ইসলামের নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোঠ রচনা করে ও তাদের যুবসংগঠন রচনা করেও যদি সবাই অসাম্প্রদায়িক থাকতে পারেন, তাহলে আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক বলার পিছনে যুক্তি কোথায়? আমরা সকল মুসলমানকে মুসলমান হিসাবে বিশ্বাস করি। সকল মুসলমানের পিছনে ছালাত আদায় ও বিয়ে-শাদী সবকিছু জায়েয মনে করি। তবে একটি ক্ষেত্রে আমরা আপোষ করি না। সেটি হল শিরক ও বিদ'আতের সঙ্গে আমাদের কোন অবস্থাতেই কোন সম্পর্ক নেই। আর সেকারণেই বিদ'আতীদেরকে মুসলমান হিসাবে স্বীকার করলেও তাদেরকে আমরা আহলেহাদীছ হিসাবে গ্রহণ করি না। আর তারাও এই নামটি সঙ্গত কারণেই ব্যবহার করতে ভয় পান।

বন্ধুগণ! আহলেহাদীছ আন্দোলন কখনোই ভোট চাওয়ার আন্দোলন ছিল না। আজও নয়। আমরা চাই মানুষ মানুষের অন্ধ অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে নিরংকুশভাবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য বরণ করে নিক। আর এ পথেই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা কামনা করি, অন্য কোন পথে নয়।

অতএব আহলেহাদীছ আন্দোলনের সূর্য সারথী আমার তরুণ বন্ধুগণ! আপনারাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। এদেশে আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও রাসূলের নিরংকুশ নেতৃত্ব কায়েম করার দায়িত্ব আপনাদের। আপনাদের প্রতি ফোঁটা রক্ত আল্লাহ্র অমূল্য আমানত। আসুন! তা ব্যয় করি আল্লাহ্র পথে, রাসূলের পথে, কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভেজাল সত্য কায়েমের পথে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন !!

সাক্ষাৎকার

[‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবে’র এই স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন ‘তাওহীদের ডাক’-এর পক্ষ থেকে মুযাফফর বিন মুহসিন ও নূরুল ইসলাম]

***তাওহীদের ডাক :** *‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র প্রথম মুখপত্র ‘তাওহীদের ডাক’ (জানু-ফেব্রু’৮৫) আপনার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে পুণরায় যুবসংঘের পক্ষ থেকে ‘তাওহীদের ডাক’ নামক মুখপত্রটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ মূহূর্তে আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি কি?*

আমীরে জামা‘আত : অনেকটা হারানো সন্তান ফিরে পাওয়ার মত।

***তাওহীদের ডাক :** *তৎকালীন প্রেক্ষাপট আর আজকের প্রেক্ষাপটের মধ্যে বিশেষ কি ধরনের তফাৎ দেখছেন?*

আমীরে জামা‘আত : তখন আমাদের মাথার উপর কোন ছাতা ছিল না। কেবলমাত্র আল্লাহর রহমত ব্যতীত। ছিল না উৎসাহ দেওয়ার মতো কোন অভিভাবক। বাধা ছিল বহুরূপ। আলহামদুলিল্লাহ আজকের দিনে পরিস্থিতি বহুগুণ অনুকূলে এসেছে।

***তাওহীদের ডাক :** *মুখপত্রটি প্রকাশের সময় কোন প্রেরণাটি বেশী কাজ করেছিল?*

আমীরে জামা‘আত : ‘শতদল ফুটতে দাও’-এই অনুপ্রেরণা এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের দা‘ওয়াত জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

***তাওহীদের ডাক :** *যুবসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন।*

আমীরে জামা‘আত : আমার পিতা মাওলানা আহমাদ আলীর (১৮৮৩-১৯৭৬) নিবিড় সংস্পর্শে শৈশবেই দ্বীনের পথ খুঁজে পেয়েছিলাম। পরবর্তীতে মাদরাসা ও কলেজ জীবনে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ইসলামী সাহিত্য ও বামপন্থী বই-পত্র পড়াশোনা করার সুযোগ হয়। সেই থেকেই নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমে জীবন পরিচালনার ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। কিন্তু এ বিষয়ে সুলিখিত সাহিত্য তখন সহজপ্রাপ্য ছিল না। অন্যদিকে আহলেহাদীছ একটি ‘রফা‘দানী’ ফের্কার রূপ ধারণ করায় অন্যদের থেকে তার পৃথক বৈশিষ্ট্য খুব কমই অনুভূত হত। খুলনার এমএম সিটি কলেজে আসার পর কয়েকজন সমমনা বন্ধুদের নিয়ে অনেকটা অবচেতন ভাবেই ‘আঞ্জুমানে শুব্বানে আহলেহাদীছ’ নামে ঘরোয়াভাবে একটি প্লাটফর্ম তৈরী করে নিজেদের মাঝে দা‘ওয়াতী কাজ শুরু করি। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী কয়েকজন সাথীভাই মিলে যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ গঠন করি। যাত্রাবাড়ী থেকেই বংশাল, নাজিরাবাজার, বাংলাদুয়ার, সুরীটোলা, মালিটোলা, মোগলটুলী এলাকার যুবকদের সাথে যোগাযোগ করতাম। মসজিদে অথবা বৈঠকখানাতেই আমাদের দা‘ওয়াতী প্রোগ্রামগুলো হত। প্রায়ই মীরপুরে যেতাম। সেখানে স্বল্প সময়েই আমাদের আটটি শাখা গঠিত হয়েছিল। পার্শ্ববর্তী পাঁচরুখী, দোলেশ্বর, বেরাইদ, ধামরাই প্রভৃতি এলাকাতেও আমরা সফর করতাম। একবার ময়মনসিংহের ভালুকায় যাই এবং যুবসংঘের শাখা গঠন করি। সাপ্তাহিক আরাফাতে আমাদের রিপোর্ট প্রকাশের ফলে সারাদেশে আহলেহাদীছ যুবকদের মাঝে প্রাণের সাড়া জাগে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তারা শাখা গঠন করতে থাকে। সারাদেশ থেকে আগত চিঠিপত্রের জওয়াব লিখতেই আমরা গলদঘর্ম হয়ে যেতাম। ঢাকার যাত্রাবাড়ী পোষ্ট অফিস বলা যায় যুবসংঘের ব্যাপক চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের কারণেই টিকে যায়। এজন্য পোষ্টমাষ্টারের পক্ষ থেকে আমাদের প্রায়ই ধন্যবাদ জানানো হ’ত। যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় শিক্ষকতা, এম.এ শেষ বর্ষে থিসিস লেখা, বিভিন্ন লাইব্রেরীতে যেয়ে পড়াশোনার ফাঁকেই ঢাকা ও ঢাকার বাইরে সাংগঠনিক সফর করতাম। যাতায়াত ব্যবস্থার দুর্দশার মধ্যে দুরূহ হলেও আল্লাহর রহমতকে পুঁজি করে আমরা দা‘ওয়াতী কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে চলেছিলাম। ১৯৭৮ সালের ১২ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত নাইক্ষ্যংছড়ি ও টেকনাফ অঞ্চলে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থী মুসলমানদের মাঝে যুবসংঘের ত্রাণ তৎপরতা, ১৯৭৯ সালের জুনে কবরপূজার বিরুদ্ধে রাজধানীতে যুবসংঘের বিরাট মিছিল, ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ এপ্রিল ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে যুবসংঘের উদ্যোগে ‘তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ’ শীর্ষক সেমিনার ও পরদিন ঢাকা যেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলন ও সম্মেলনপরবর্তী ট্রাক মিছিল রাজধানী ও রাজধানীর বাইরে বিশেষ করে আহলেহাদীছদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এতে অপ্রত্যাশিতভাবেই ‘যুবসংঘ’ অনেকের শত্রুতার মুখে পড়ে যায়। ফলে এক পর্যায়ে ১৯৮০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী মাদরাসা থেকে আমি চলে আসতে বাধ্য হই। অতঃপর ২৫ সেপ্টেম্বর’৮০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে খণ্ডকালীন লেকচারার হিসাবে যোগদান করি এবং পুনরায় যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় ফিরে যাই। কিন্তু ডিসেম্বরে একই কারণে আবারও চলে আসতে বাধ্য হই। শেষ পর্যন্ত ঢাকা ত্যাগ করে ১০ ডিসেম্বর’৮০-তে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসাবে অস্থায়ীভাবে যোগদান করি। যুবসংঘের কেন্দ্রীয় অফিস তখন ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী অর্থাৎ যাত্রাবাড়ী মাদরাসা থেকে মাদরাসাতুল হাদীছ, নাজিরাবাজার, ঢাকায় ৯৪, কাযী আলাউদ্দীন রোডে স্থানান্তরিত হয়। যুগ্ম-আহ্বায়ক মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী তখন মাদরাসাতুল হাদীছের শিক্ষক ছিলেন এবং উনার ঠিকানাতেই চিঠি আদান-প্রদান হ’ত। পরে ১৯৮৪ সালের ৩০ মে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় অফিস মাদরাসা মার্কেট (৩য় তলা), রাণীবাজার, রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়। এখানেও নানাবিধ বাধার

শিকার হওয়ার পর পরিশেষে ১৯৯৩ সালে নওদাপাড়ায় কেন্দ্রীয় অফিস স্থানান্তরিত হয়। সংক্ষেপে বলা চলে যে, 'যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরটা আমরা নিরুপদ্রবভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম। ফলে দ্বিতীয় বছর সাথীদের মাঝে উদ্দাম গতি ছিল। কিন্তু অচিরেই পরবর্তী বছরগুলোতে নানামুখী বাধা আমাদের ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। এজন্য শেষ পর্যন্ত ঢাকা ছাড়তেও বাধ্য হ'তে হয়। একই বাধার কবলে পড়ে ১৯৮৫ সালে যুবসংঘের মুখপত্র 'তাওহীদের ডাক' সরকারী নিবন্ধন পেতে ব্যর্থ হয়। সেই যুবসংঘের পক্ষ থেকেই ২০১০ সালে এসে এই পত্রিকাটির পুনঃপ্রকাশ আমাকে স্মৃতিকাতর করে তুলেছে।

তাওহীদের ডাক : আন্দোলন পরিচালনার শুরুতে প্রতিকূল পরিবেশে অনেক দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হ'তে হয়েছিল আপনাকে। দু'একটি স্মরণীয় ঘটনা বলুন।

আমীরে জামা'আত : আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। তার একটি ছিল ১৯৭৪ সালে খুলনা হাদীস পার্কে আহলেহাদীছ ঈদের জামা'আত প্রতিষ্ঠার ঘটনা। আমি তখন ৬৯ খান জাহান আলী রোডে অবস্থিত একমাত্র আহলেহাদীছ মসজিদের দোতলায় থাকতাম। পড়াশোনার ফাঁকে সমমনা যুবকদের নিয়ে প্রথমে খুলনা শহরে আহলেহাদীছ জনসংখ্যার একটা হিসাব করার চিন্তা করি। এজন্য ফরমও ছাপি। মসজিদে প্রতি সপ্তাহে দেয়ালিকা টাঙাতে থাকি। এক পর্যায়ে চিন্তা আসে যে, মহানগরীর সকল আহলেহাদীছকে এক ময়দানে নিয়ে একত্রে ঈদের ছালাত আদায় করব। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম। উৎসাহ পেলাম। কথায় কথায় চারিদিকে প্রচার হয়ে গেল। ডি.সি. ছাহেবের অনুমতি নেওয়ার জন্য খুলনার প্রভাবশালী জনৈক মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিককে দায়িত্ব দেওয়া হ'ল। কিন্তু ডি.সি. ছাহেব ছিলেন ঘোর আহলেহাদীছ বিদ্বেষী। তিনি অনেক আজে-বাজে কথা বলে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর ঈদের জামা'আতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সিটি আহলেহাদীছ মসজিদের ইমাম বরাবর একটা চিঠি পাঠালেন। শুধু তাতেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না; রাতে ড্রাইভারকে খালি গাড়ি দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন ইমাম ছাহেব ঐ রাতেই আহলেহাদীছ মুছল্লীদের বাড়ী বাড়ী যেয়ে নিষেধ করে আসেন। আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। হর্ণের একটানা শব্দে জেগে উঠলাম। তারপর নীচে নেমে এসে চিঠি পেলাম যে, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করা হবে। চিঠিটা পকেটে রেখে ড্রাইভারকে বললাম, ডি.সি. ছাহেবকে সালাম দিয়ে বল, গাড়ী লাগবে না ইমাম ছাহেব নিজেই ব্যবস্থা নিবেন।

রাতেই ইমাম ছাহেব এ বিষয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করলেও আমি এড়িয়ে গেলাম। ফজরের জামা'আতেও কাউকে বললাম না। কেবল মুতাওয়াল্লী ও ক্যাশিয়ার দু'জন মুরুব্বীকে বললাম। শুনে তারা ভীত হয়ে পার্শ্ববর্তী ঈদগাহে চলে গেলেন। আমি সময়মত বিশ্বস্ত কয়েকজন সাথীকে নিয়ে হাদীস পার্ক অভিমুখে চললাম। উৎসাহী দু'আড়াইশ মুছল্লী তখন অকুস্থলে পৌঁছে গেছেন। অল্প দূরে সার্কিট হাউস ময়দানের জামা'আতের আধা ঘণ্টা আগে আমাদের জামা'আতের সময় দেওয়া ছিল। ইতিমধ্যে দুই ট্রাক পুলিশ দুই গেইটে এসে অবস্থান নিয়েছে। জামা'আতের প্রাক্কালে আমি ডি.সি. ছাহেবের চিঠিটা পকেট থেকে বের করে সবাইকে পড়ে শুনালাম এবং বললাম, যারা আজকে ছালাত আদায় করে আমার সাথে জেলে যেতে চান, কেবলমাত্র তারাই থাকেন, বাকীরা চলে যেতে পারেন। একথায় সবাই যেন চেতনা ফিরে পেল। আলহামদুলিল্লাহ সবাই জামা'আতে শরীক হ'ল। কেউ চলে যায়নি। ছালাত শেষে আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর খুৎবা দিলাম। শেষে বললাম, এ দেশে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে কিন্তু আহলেহাদীছদের নেই। এমনকি এই সরকারী মাটিতে আমরা বছরে দু'দিন ঈদের ছালাত আদায় করব, সেখানেও সরকারের আপত্তি। আমরা আজ এখানে ঘোষণা দিতে চাই যে, এই হাদীস পার্কে এখন থেকে প্রতি বছর আহলেহাদীছদের ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য সরকারী যে কোন নির্যাতন ভোগ করতে আমরা প্রস্তুত আছি। উপস্থিত মুছল্লীরা সোচ্চারভাবে আমার এ প্রস্তাব সমর্থন করল। আলহামদুলিল্লাহ আজ পর্যন্ত খুলনা হাদীস পার্কের ময়দানে আহলেহাদীছ ঈদের জামা'আত অব্যাহতভাবে চলে আসছে।

ছালাত শেষে বের হবার সময় পুলিশ বাহিনীর দায়িত্বশীল ভদ্রলোক নতমুখে সালাম করে বললেন, আমাদের মাফ করবেন। আমরা সবই শুনলাম। শান্তি ভঙ্গের কিছুই এখানে ঘটেনি। আমরা ডি.সি. ছাহেবকে গিয়ে বুঝিয়ে বলব।

আরেকটি ঘটনা- ঢাকায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের তৎকালীন ডি.জি. এ জেড এম শামসুল আলমের উদ্যোগে ১৬টি ইসলামী দলের সমন্বয়ে 'সিসকো' (CISCO) নামের একটি সংস্থা গঠিত হ'ল। উদ্দেশ্য বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া। ১৬টি দলের মধ্যে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' একটি। একদিনের ঘটনা। ডি.জি. ছাহেবের উদ্দেশ্যে আহলেহাদীছ যুবসংঘের পক্ষ থেকে আমরা তিনটি প্রস্তাব রাখলাম। (১) বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে বড় পীরের মাযারের গিলাফ সরাতে হবে যেখানে তখন আগর-বাতি, মোমবাতি দিয়ে প্রায় পূজা-অর্চনা শুরু হয়ে গিয়েছিল (২) বায়তুল মোকাররম মসজিদে মহিলাদের ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের জন্য একটা পৃথক ফ্লোর দিতে হবে (৩) বায়তুল মুকাররম মার্কেট শুক্রবার বন্ধ রাখতে হবে যাতে জুম'আর ছালাতে পরিবেশ সুন্দর থাকে। প্রস্তাবগুলোর ব্যাপারে তিনি সকলের মতামত চাইলেন। কেউ চুপিসারে দু'একটি মন্তব্য করলেন। তখন ডি.জি. ছাহেব আমাকে আমার প্রস্তাবগুলির পিছনে যুক্তি পেশ করতে বললেন। আমি সাধ্যমত দলীল পেশ করলাম। হাউজ চুপ। ডি.জি. সাহেব উৎফুল্ল। বিনা বাধায় প্রস্তাব তিনটি গৃহীত হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ সেদিন থেকে অদ্যাবধি বায়তুল মুকাররমে উক্ত সিদ্ধান্তগুলো বহাল রয়েছে। এবার ডি.জি. ছাহেব অমানবিক হিল্লা প্রথা সম্পর্কে কথা তুললেন। আমি এর বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রেখে বললাম, এর জন্য দায়ী হল এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক হিসাবে গণ্য করা। এটা দূর না করা পর্যন্ত হিল্লা প্রথা দূর হবে না। সদস্যগণ কিছু কথা বললেন। অবশেষে ডি.জি. ছাহেব আমাকে পরামর্শ দিলেন, আপনি যুবসংঘের ছেলেদের নিয়ে আমার অফিস অবরোধ করুন। তখন আমি সরকারকে আপনাদের দাবী তুলে ধরব। এতে দ্রুত ফল হবে। তারপর বৈঠক শেষ হল।

তাওহীদের ডাক : যুবসংঘের সমাজকল্যাণমূলক কাজে জড়িত হওয়ার প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু বলুন।

আমীরে জামা'আত : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এ দেশের বুকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়া। এজন্য শুরু থেকেই সমাজকল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে আমরা জোর দিয়েছিলাম। দলমত নির্বিশেষে আমরা সবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম। ঐ সময় বার্মা থেকে হঠাৎ রোহিঙ্গা মুসলমান বিতাড়ন শুরু হয়। নির্যাতিত বর্মী মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোকে আমরা দ্বীনী ও সামাজিক কর্তব্য মনে করি। পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, নিযামে ইসলাম পার্টির মাওলানা ছিদ্দীক আহমাদ (পটিয়া) ও আলহাজ্জ আকীল (বংশাল) প্রমুখের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়। আমরাও তাদের সাথে যুক্ত হ'লাম। নবাবপুর ও বংশাল এলাকায় দোকানে দোকানে ও বাড়ীতে-বাড়ীতে গিয়ে ব্যাপকভাবে ত্রাণ সংগ্রহ করলাম। দুর্গত মানুষের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ করার যে প্রেরণা তখন যুবসংঘের ছেলেরা অনুভব করত, তা ছিল অবর্ণনীয়। বৃষ্টি-বাদল উপেক্ষা করে দুয়ারে-দুয়ারে ব্যানার নিয়ে ঘুরে বহু ত্রাণ সংগৃহীত হ'ল। অতঃপর ১২ মে'৭৮ ঢাকা থেকে আমাদের ত্রাণবোঝাই ট্রাক রওয়ানা হয়। চট্টগ্রাম পৌঁছে প্রেসক্লাবে ভাষণ দিলেন নেতারা। এরপর তারা বিমানে চড়ে কক্সবাজার গেলেন। আমাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের সাথে যেতে হ'ল। এটাই ছিল আমার প্রথম বিমান ভ্রমণ। কক্সবাজার গিয়ে বিরূপ আবহাওয়া ও প্রচুর ঝড়বৃষ্টিতে নেতারা পিছুটান দিলেন। তাদের সাথে কর্মী ছিল না। ত্রাণসামগ্রীও ছিল কম। ফলে যুবসংঘের দায়িত্বে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে ওনারা ওখান থেকেই বিদায় হ'লেন। যুবসংঘের সদস্য আমরা ছিলাম ১২ জন। সঙ্গে পেলাম লালবাগ মাদরাসার একজন শিক্ষককে (দীলখোলা, খুবই বন্ধুবাৎসল এই মানুষটির নাম সম্ভবত ফযলুল হক)। আমরা সবাই অনভিজ্ঞ ও অজানা পথের যাত্রী। নাইক্ষ্যংছড়ি পৌঁছলাম। বৃষ্টি-কাদার মধ্যে মালামাল নামালাম। জঙ্গলের গাছের পাতা দিয়ে দোচালা করে কোনমতে মাথা গোঁজার ঠাঁই বানালাম। বিস্কুট-পাউরুটি, চিড়ামুড়ি ইত্যাদি শুকনা খাবারই সম্বল। বিদ্যুৎবিহীন বৃষ্টিস্নাত রাতে নিস্তব্ধ বনে রাত্রিযাপনের এক ভীতিকর অভিজ্ঞতা হল। সকালে গেলাম দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। তিনি এতগুলো তরুণ মুখ একত্রে দেখে খুবই খুশী হলেন। ত্রাণ অনেকেই দিয়েছেন কিন্তু সেসব বিতরণের জন্য কোন স্বেচ্ছাসেবীর কোন দেখা মিলছিল না। অপরদিকে শরণার্থীদের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত অপর্যাপ্ত পুলিশ হিমশিম খাচ্ছিল। তিনি পুলিশের সহায়তায় রাতে ডিউটি করার জন্য আমাদের সাহায্য চাইলেন। আমরা রাযী হ'লাম। এছাড়াও দিনের বেলায় তাদের জন্য ত্রাণ বিতরণ, ঘর নির্মাণ, ছালাতের স্থান তৈরী এবং তাদেরকে মানসিকভাবে শক্ত রাখার দায়িত্ব নিলাম। একেক এলাকায় তাদের জমা করে নারী-পুরুষ সবার উদ্দেশ্যে উর্দূতে উৎসাহমূলক বক্তব্য রাখতাম। আমাদের দিনরাতের আন্তরিক সেবা ও পরিশ্রমে তারা এতটাই মুগ্ধ হয় যে, ২৪ মে ফেরার দিন তাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অনুরোধেই আমরা এতদিন ছিলাম। বিদায় বেলায় তিনিও চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। এ ক'টি দিনের মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা, অসহায় স্বজনহারা, স্বদেশহারা মানুষের চোখের পানি ছিল সেদিন যুবসংঘের জন্য ভবিষ্যতের পাথেয়। এ বিষয়ে 'করুণ অভিজ্ঞতা' শিরোনামে আমার একটি লেখা সাপ্তাহিক আরাফাতে পরপর তিন কিস্তিতে বের হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালেও যুবসংঘের আরেকটি টীম টেকনাফ এলাকায় রোহিঙ্গা শিবিরে ত্রাণ সাহায্য নিয়ে গিয়েছিল। (ক্রমশ)

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে দীর্ঘদিন পর নতুন অবয়বে যাত্রা শুরু করল 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-নির্বাহী সম্পাদক

অস্থির পাকিস্তান : কালো মেঘের ঘনঘটা

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

প্রসঙ্গ কথা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র দুনিয়ায় স্বাধীনতার উত্তাল তরঙ্গ উপচে পড়ে। এই তরঙ্গে ভেসে যায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। বৃটিশদের পতনের পর বিশ্বের দুই পরাশক্তির মাঝে শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদী আশা আফগানিস্তানের পাহাড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লে সমগ্র বিশ্বের একক পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয় আমেরিকা। সমগ্র বিশ্বকে করতলগত করার জন্য তারা প্রণয়ন করে এক সর্বগ্রাসী নতুন ধারার সম্রাজ্যবাদী নীতি। আমেরিকা কেন্দ্রিক এক নয়া বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বায়নের নামে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে সারাবিশ্বকে একক কেন্দ্রের অধীনে এনে শাসন করার পরিকল্পনা হাতে নেয়। তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা আদর্শিক শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে ইসলাম তথা মুসলিম বিশ্বকে। এরই অংশ হিসাবে তারা বর্তমান বিশ্বে 'সন্ত্রাসবিরোধী শান্তিরক্ষী যোদ্ধা'র তকমা লাগিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলিম বিশ্বসহ সমগ্র পৃথিবীকে নিজেদের অজ্ঞাবহ দাস বানানোর পরিকল্পনা বাস্ত বায়ন করে চলেছে। তাদের ষড়যন্ত্রের ভয়াল থাবা আজ আফগান ও ইরাককে কুরে কুরে খাচ্ছে। তাদের এই থাবার পরবর্তী টার্গেট পাকিস্তান। মুসলিম বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র দিন দিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

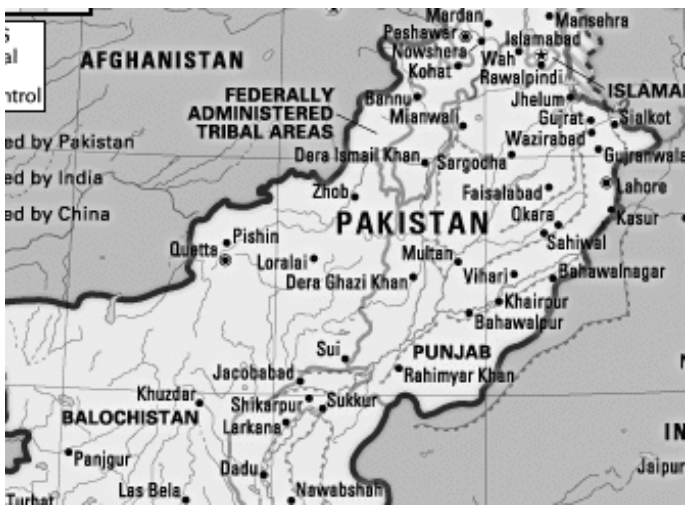

অতীত ও বর্তমানের আলোকে পাকিস্তান : আজ থেকে বহু বছর পুর্বে ৭১১ খৃষ্টাব্দে অসীম সাহসী বীর শার্দুল মুহাম্মাদ বিন কাসিম পাকিস্তানের সিন্ধুতে সফল অভিযান পরিচালনা করে পাকিস্তানের বুকে ইসলামের প্রদীপ শিখা জ্বালিয়ে দেন। তারপর প্রায় হাযার বছর ধরে মুসলমানরা স্বগৌরবে এ উপমহাদেশ শাসন করে আসছিল। কিন্তু যেদিন বৃটিশ বণিকদের জাহাজ বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে বাংলার পদপ্রান্তে নোঙ্গর ফেলে সেদিন এই সোনালী যুগের বিদায় ঘন্টা বেজে উঠে। তারপর পলাশীর মর্মান্তিক ঘটনার মাধ্যমে সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনের পতন ঘটে এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ গড়ে উঠে। এরপর থেকে শুরু হয় ব্রিটিশদের নির্যাতনের স্টীম রোলার। এ হায়েনাদের অসহ্য নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জনগণ আরেকবার জিহাদের নব উদ্দীপনায় জেগে উঠে। সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়ে ১৯৪৭ সালে খণ্ডিত আকারে হলেও পাকিস্তান নামের একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানী নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা, হঠকারিতা এবং ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা পাকিস্তানের ভিত্তিকে টলমল করে তোলে। ফলশ্রুতিতে মাত্র ২৪ বছরের মাথায় দেশের একটা অংশকে হারিয়ে আভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের শিকার হয় পাকিস্তান। অন্যদিকে ভারতীয়দের নিদারুণ শত্রুতা ও কাশ্মীর নিয়ে স্থায়ী টানাপোড়েনে কখনোই দেশটি নিজের পায়ে শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এভাবে নেতৃত্বের অদক্ষতা আর প্রতিবেশীর হুমকি থেকে নিজেকে রক্ষার দুশ্চিন্তা শুরু থেকেই পাকিস্তানকে সদাশংকিত ও আত্মবিশ্বাসহীন অবস্থায় রেখেছে। পাকিস্তানের অবস্থা সেই মাঝির মত যে শত চেষ্টা করেও তার তরীকে আর উজানে নিতে পারছে না। ফলে তাকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হয়েছে। বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকেই সে আশ্রয় নেয় মার্কিন পক্ষপুটে। অন্যদিকে ভারত মৈত্রীবন্ধন রচনা করে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে। পরিহাসের বিষয় এই যে, ভারত কখনো সোভিয়েত ইউনিয়নের তাঁবেদার না হলেও পাকিস্তান আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হতে সময় নেয়নি। আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমান রাশিয়া ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের প্রতিটি বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমেরিকা তার স্বার্থ পূরণ হয়ে গেলেই পাকিস্তান থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। দুনিয়া কাঁপানো ৯/১১-এর পর দিশেহারা পাকিস্তান যখন যুক্তরাষ্ট্রের হুমকিতে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে যোগ দিয়ে নাকে দড়ি পরেছে। সে পরিস্থিতিতেও ভারত দিব্যি স্বীয় মর্যাদা রক্ষা করে মার্কিন, রুশ উভয়ের বিশ্বাস ও মৈত্রী লাভে সক্ষম হয়েছে।

পাকিস্তান ধ্বংসের মহাপরিকল্পনা : সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমাদের শ্যেন দৃষ্টি এখন মুসলিম বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র এই পাকিস্তানের প্রতি। যুক্তরাষ্ট্র বহুদিন ধরে পাকিস্তানের শক্তিমত্তাকে দুর্বল করার জন্য সেখানকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল রাখতে সচেষ্ট থেকেছে। সাম্প্রতিক সময়ে তাদের পরিচালিত ষড়যন্ত্রের কিছু নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল। -

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রই নওয়াজ শরীফ সরকারের পতন ঘটিয়ে পারভেজ মোশাররফকে ক্ষমতায় আনে। পাকিস্তানের বর্তমান দুরবস্থার জন্য অনেকটাই দায়ী সাবেক এই সেনাপ্রধান। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে মোশাররফ আমেরিকার ঘনিষ্ট সহযোগী ও হাতের ছড়ি হয়ে উঠায় পাকিস্তানের আজ এই অচলবস্থা। এটা ওপেন সিক্রেট যে, এই আমেরিকাই গত শতকে জেনারেল জিয়াকে হত্যা করে পাকিস্তানকে মেরুদণ্ডহীন করার অপপ্রয়াস চালায়। এর পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিল নিজের অনুগত তল্পীবাহক শাসককে ক্ষমতায় নিয়ে আসা এবং পাকিস্তানের রাজনীতিতে চরম বিভক্তি সৃষ্টি করা। যার ধারাবাহিকতায় তাদের এককালের তল্পীবাহক বেনজির ভুট্টোকে ২০০৭ সালের

ডিসেম্বরে হত্যা করা হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এ হত্যাকাণ্ডটি পাকিস্তানের রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা ও জাতি হিসাবে পাকিস্তানকে একটি ভঙ্গুর অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়া মার্কিন পরিকল্পনারই অংশ ছিল। Anglo-American ambition behind the assassination of Benozir bhotto and disstabilization of pakistan' শীর্ষক এক নিবন্ধে ল্যারি চিন বলেন 'বুশ-চেনি প্রশাসন ও তার মিত্ররা পাকিস্তানের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ জোরদার করেছে এবং এর অংশ হিসাবে বেনজিরের মৃত্যু ও মোশাররফের পতন অবধারিত ছিল।[১] সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, পাকিস্তানকে রাজনৈতিক বিশৃংখলা ও অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেয়ার জন্যই তারা একের পর এক অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা উস্কে দিয়ে যাচ্ছে। গত শতকে নিকারাগুয়ায় বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য যে আমেরিকান কনসালট্যান্ট নেগ্রোপন্টেকে মার্কিন সরকার পাঠিয়েছিল বর্তমানে তাকে একই এ্যাসাইনমেন্টে পাকিস্তানে পাঠিয়ে নিয়মিত দাবার গুঁটি চালছে। তাদের সহযোগিতায় এককালের 'টেন পার্সেন্ট' বলে খ্যাত দুর্নীতিবাজ আসিফ আলী জারদারী ক্ষমতায় আসেন। যাকে ইমরান খান ২য় মোশাররফের আগমন বলে আখ্যায়িত করেছেন। যাইহোক আমেরিকা সবসময় এমন লোককেই ক্ষমতায় দেখতে চায় যারা তাদের স্বার্থ হাছিলে তৎপর থাকবে এবং জাতীয় স্বার্থ অগ্রাহ্য করায় কোন ত্রুটি করবে না। জারদারীই হলেন তাদের চাহিদামত সেই যোগ্য (!) প্রার্থী।

অর্থনৈতিক বিপর্যয় : যুক্তরাষ্ট্র তার প্রধান দুই সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক হাতিয়ার আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংককে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মারাত্মক অর্থনৈতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করে আসছে। দুর্ভাগ্যজনক যে, বিশ্বের সকল দেশ এমনকি মুসলিম দেশগুলোও আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংককে রিযিকদাতা মনে করে। তাদের ফাঁদে পা দিয়েছে পাকিস্তানও। এই দুই অর্থনৈতিক হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানকে ভয়াবহ ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলেছে আমেরিকা। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরামর্শ অনুযায়ী তথাকথিত অর্থনৈতিক সংস্কার করতে যেয়ে দেশটি মারাত্মক ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পাকিস্তান তার চিরদিনের বন্ধু সৌদি আরব ও চীনের প্রতি দ্রুত সহযোগিতার হাত বাড়ায় কিন্তু কোন প্রকার সাড়া না পেয়ে পাক সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আইএমএফ-এর কাছ থেকে পুনরায় মোটা অংকের ঋণ নিতে বাধ্য হয়। এভাবে মুসলিম বিশ্বের বহু উন্নয়নশীল দেশের মত পাকিস্তানকে আইএমএফ ঋণের বেড়াজালে আটকিয়ে অনুগত দাসে পরিণত করে ক্রুর হাসি হাসছে।

অভ্যন্তরীণ সমস্যা : পাকিস্তান আজ তার অস্তিত্ব নিয়ে হুমকির মুখে, বিশেষ করে বালুচদের ভয়াবহ বিদ্রোহ পাকিস্তানের জন্য এক অশনি সংকেত। বর্তমানে ভারত ও মার্কিনের গোয়েন্দাদের অপতৎপরতায় তা নতুন গতি পেয়েছে। সিআইএ ও তার দোসররা যেমন পূর্ব তিমুরের গেরিলাদেরকে সহযোগিতা দিয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল ঠিক একই প্রক্রিয়ায় 'বালুচ লিবারেশন আর্মি' (বিএলএ)-কে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে পাকিস্তানকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। ২০০৫ সালে এনআইসি ও সিআইএ কর্তৃক প্রণীত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'পাকিস্তানকে যুগোশ্লাভিয়ার পরিণতিই বরণ করতে হবে'। তথা যুগোশ্লাভিয়া যেমন নানা সংকটে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল তেমনিভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলা, দুর্নীতি, জঙ্গি তৎপরতা, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অপতৎপরতা, আমেরিকার ড্রোন বিমান হামলা, তালেবানদের উত্থান, সেনা-তালেবান সংঘাত এবং মুম্বাই হামলার চাপানো দায় মাথায় নিয়ে পাকিস্তান আজ সে পথেই এগুচ্ছে। মূলত আমেরিকা চায় পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও ইরানের বালুচ এলাকা নিয়ে গ্রেটার বেলুচিস্তান গঠিত করতে এবং এভাবে মুসলিম বিশ্বের দুই শক্তিধর রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে খান খান (বলকানাইজেশন) করতে । যেমন সাবেক মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তা লে.কর্নেল র‍্যালিফ পিটার্স 'দ্য আর্মড ফোর্সেস জার্নালে' ২০০৬ সালের জুন সংখ্যায় পাকিস্তানকে ভেঙ্গে বর্তমান ভূখণ্ডের অর্ধেকে নামিয়ে নিয়ে আসার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[২] শত কোটি মুসলিমের আবাসস্থল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, রাশিয়া ও চীনকে ঘিরে ন্যাটো শক্তিবলয় গড়ে তোলা ও ভারত মহাসাগরের নিরংকুশ আধিপত্য গ্রহণ করাই বর্তমানে আমেরিকার টার্গেট। 'ফরেন এ্যাফেয়ার্স' পত্রিকা বলছে, ভারত মহাসাগর হল একবিংশ শতাব্দীর কেন্দ্রীয় মঞ্চ। 'বৃহত্তর ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল জড়িয়ে আছে সাহারা মরুভূমি থেকে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ইসলামের সমগ্র খিলানটিতে... এর সীমার মধ্যে রয়েছে সোমালিয়া, ইয়েমেন, ইরান ও পাকিস্তান। এই সাগর ঘিরেই চলছে গতিশীল বাণিজ্য, দানা বেঁধেছে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ, জলদস্যুতা ও মাদক চোরাচালান। এর পূর্ব প্রান্তে বাস করে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার শত কোটি মুসলিম।'[৩] এ কাজে মার্কিনরা পাকিস্তানের চিরশত্রু ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নিচ্ছে যার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে একজন নেতৃস্থানীয় মার্কিন বিশেষজ্ঞ র‍্যান্ড ক্রিস্টাইন আমেরিকার 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স জার্নাল' আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'বেলুচিস্তানে অস্থিরতা বাড়াতে ভারতের জড়িত থাকার বিষয়ে পাকিস্তানের উদ্বেগ যুক্তিসঙ্গত'।[৪] বেলুচিস্তানের হাতে গোনা কয়েকজন গোত্রপতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ভারত ও মার্কিন যোগশাজশে বেলুচিস্তানে সঙ্কট সৃষ্টি করছেন। মরহুম আকবর বুগতির পৌত্র ব্রাহামদাগ বুগতির মন্তব্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি বলেছেন, ইসলামাবাদের হাত থেকে বেলুচিস্তানের সম্পদ রক্ষার জন্য ভারতের যে কোন নৈতিক সমর্থন ও বস্তুগত সাহায্য তিনি গ্রহণ করবেন।[৫] এই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সকল প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রস্তুতিতে ভারত সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে। জানা গেছে যে, আফগানিস্তানে 'পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন' কার্যক্রমের মুখোশে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও) আফগানিস্তানে বিস্ফোরক এনে বালুচদের সন্ত্রাসী কাজে সহযোগিতা করছে। মূলতঃ ভারত কয়েকটি কারণে বেলুচিস্তানের অস্থিরতার আগুনে বাতাস দিচ্ছে। যথা-

১. বেলুচিস্তানের উপকূলে গোয়াদর বন্দর চালু হওয়ায় পারস্য উপসাগরের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানী সরবরাহ লাইন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পাকিস্তান অর্জন করেছে।

২. ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃক করাচীর নৌঘাঁটি অবরোধ করা সহজ। কিন্তু গোয়াদর গভীর সমুদ্রবন্দর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পাকিস্তান করাচি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে কৌশলগত অবস্থানের অধিকারী হতে পেরেছে। যা ভারতের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছে।

---

১. *পাকিস্তান ভাঙ্গার মার্কিন মহাপরিকল্পনা*, মোতালেব জামালি, নয়া দিগন্ত, ৩ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ.৭।

২. *পাকিস্তান ভাঙ্গার মার্কিন মহাপরিকল্পনা*, মোতালেব জামালী, নয়াদিগন্ত, ডিসেম্বর, ২০০৮, পৃ.৭।

৩. *বিপন্ন মানুষ আর রক্তমাখা আতরের কথা*, ফারুক ওয়াসিফ, প্রথম আলো, পৃ: ১২, ১৯.০৫.২০০৯ (গৃহীত ফরেন এ্যাফেয়ার্স মার্চ/এপ্রিল'০৯)

৪. *বেলুচিস্তান পরিস্থিতি : ফায়দা তুলছে ভারত*, খালিদ খোকা, বঙ্গানুবাদ-মীযানুল করীম, নয়া দিগন্ত, ৩ মে ২০০৯, পৃ. ৬।

৫. ঐ।

৩. বেলুচিস্তান অঞ্চলে দিন দিন চীনের উপস্থিতি জোরদার হচ্ছে। যা ভারতের জন্য বিপদজনক।

এককথায় পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার জন্য ভারত বালুচ জনগণের মাঝে বিভেদ-বিভাজন এবং ক্ষোভ অসন্তোষ সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক অপারেশন পরিচালনা করছে। যেমন সম্প্রতি বালুচ যুবক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার জড়িত আছে বলে প্রচারণা চালানো। কিন্তু আসল ঘটনা ছিল ভিন্ন। ইউসুফ রাজা গিলানির স্বরাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা রেহমান মালিক বলেন, গত কয়েক দিন আগে যে ২০০ বালুচ নিখোঁজ হওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তাদের খোঁজ পাওয়া গেছে। এরা সবাই সীমান্ত পার হয়ে চলে গেছে আফগানিস্তানে এবং সেখানে গোয়েন্দা সংস্থা 'র' তাদেরকে বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। অতএব এটা এখন সুস্পষ্ট যে ভারত আফগান সীমান্তে উন্নয়ন কাজের নাম করে, কনস্যুলেট বসিয়ে বালুচ স্বাধীনতা আন্দোলনকে অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তাতিয়ে তুলছে।

জঙ্গী সংকটের অথৈ সাগরে পাকিস্তান : বর্তমানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগটি হল জঙ্গীবাদ। বলা হচ্ছে, এই জঙ্গীদের জন্য আগামী ছয় মাসের মধ্যে বা এক বছরে পাকিস্তান ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে যাবে। পশ্চিমা বিশ্বের আতঙ্কের কেন্দ্রবিন্দু হল পাকিস্তানের অস্ত্র ভাণ্ডারে মজুদকৃত ১০০টি পারমাণবিক বোমা। তাদের মতে নিকট ভবিষ্যতে যদি পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভেঙ্গে যায় তাহলে এসব পরমাণু অস্ত্র তালেবানদের হাতে গিয়ে পড়বে। মার্কিনীদের মতে, বিশ্বের জন্য এর চেয়ে ভয়াবহ ঘটনা আর হতে পারে না। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে তালেবানদের নবউত্থান লক্ষ্য করা গেছে। তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনা লক্ষ্য করে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ম্যারিয়েট হোটেলে হামলা, পুলিশ স্টেশনে হামলা, শ্রীলংকান ক্রিকেটারদের উপর হামলা ইত্যাদি। এছাড়াও নৃশংসভাবে তারা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে মসজিদ-মাদরাসা ও পাবলিক প্লেসে। তালেবান নেতাদের মধ্যে মাওলানা ফযলুল্লাহ গত বছর সোয়াতে শরী'আহ আইন জারির মাধ্যমে সরকারের সাথে শান্তিপূর্ণ আলোচনায় সফলতা অর্জন করেন। পাকিস্তানের জনগণও একে স্বাগত জানায়। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের এই সহনশীল আচরণকে আমেরিকান সরকার ও গণমাধ্যমগুলো জঙ্গী দমনে পাকিস্তানের পরাজয় ও জঙ্গীদের বিজয় বলে প্রচার করা শুরু করে এবং সোয়াতে মানবাধিকার লংঘন হচ্ছে বলে তার স্বরে উদ্বেগ প্রকাশ করে। অথচ যারা নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করছেন তারা বলেছিলেন, পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে এই চুক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। পরবর্তীতে তালেবানরা সোয়াতের সফলতায় অতি উৎসাহী হয়ে সোয়াত পার্শ্ববর্তী বুনার প্রদেশ দখল করে নিয়ে সারা বিশ্বে হৈচৈ ফেলে দেয়। এই সুযোগে আমেরিকার গণমাধ্যমগুলো আরও ফলাও করে প্রচার করে যে, জঙ্গীরা পাকিস্তান দখল করার জন্য ইসলামাবাদ অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে, তারা এখন ইসলামাবাদ থেকে এত কি.মি. দূরে অবস্থান করছে। এই অতি প্রচার পাক সরকারকে বিপাকে ফেলে দেয়। সত্যি বলতে কি, এই পরিবেশে সোয়াতের যোদ্ধাদের অভিযানটি ছিল একটা আত্মঘাতি অভিযান। মূলত শান্তি চুক্তিতে সফলতা লাভের পর তাদের উচিৎ ছিল পাকিস্তানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের আসল শত্রু আমেরিকার দিকে লক্ষ্য করা এবং সোয়াতে শরীআ আইন যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে একটি দৃষ্টান্ত মূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। যা দেখে অন্ততপক্ষে মুসলিম বিশ্বের শাসকগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু তারা নিতান্ত অবিবেচকের মত নিজ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে আগ বাড়িয়ে অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধে লিপ্ত হল। ফলে আমেরিকার চাপে নড়বড়ে সরকার বাধ্য হয়ে জঙ্গীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেছে এবং জঙ্গীদেরকে বুনার অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর শান্তিচুক্তির আওতাভুক্ত সোয়াত অঞ্চলেও জঙ্গী বিরোধী অভিযান শুরু করে। অতঃপর বর্তমানে ওয়াজিরিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পাকিস্তানী সেনা ও তালেবানসহ সেখানে নিহত হয়েছে কয়েক সহস্রাধিক। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধাঞ্চল ছেড়ে নিরাপদ অশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে। এই ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ পাকিস্তানকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে। পাক সেনাবাহিনী এখন নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে এবং নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধেই শেষ করে দিচ্ছে।

ইমরান খান বলেন, 'পাকিস্তান শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন হামলাই অনুমোদন করেনি বরং নিজ সেনাবাহিনীকে তাদের নিজ জনগণের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠান হচ্ছে। এটাই ছিল সবচেয়ে বড় কৌতুক। এটি অশ্রুতপূর্ব ও নযীরবিহীন যে, নিজের সেনাবাহিনী নিজের জনগণকে হত্যা করছে।[৬] এত বড় ধরনের অভিযান চালানোর পরও পাকিস্তান তার প্রভু আমেরিকাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, এই অভিযানের ফল হবে অত্যন্ত নগণ্য ও ব্যর্থ। তারা পাকিস্তানের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে, খোলাখুলি প্রস্তাব করে যে, যেহেতু পাকিস্তান এককভাবে জঙ্গীদের সামাল দিতে পারছেনা তাই পাক ও আমেরিকার সৈনিকরা পাক সীমান্তে একসাথে যৌথ অভিযান পরিচালনা করলে জঙ্গীদের দমন করা যাবে। অবশ্য পাকিস্তান তাদের এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যদিকে জঙ্গীদের দমন নিয়ে এই লেজে-গোবরে অবস্থার মধ্যে জঙ্গী দমনের নামে আমেরিকা চালকবিহীন ড্রোন গোয়েন্দা বিমান হামলা করছে। পাকিস্তান সরকারের সকল অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এ পর্যন্ত মার্কিনীরা পাক সরকারের বিনা অনুমতিতে ২২ বারেরও বেশী বিমান হামলা করে এবং প্রায় ৩০০ জন পাকিস্তানী নাগরিককে হত্যা করে, যাদেরকে জঙ্গী বলে চালিয়ে দেয়া হয়। তাই এ মুহূর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় পাকিস্তানের ভাগ্যাকাশে দিগন্তব্যাপী কালো মেঘের ঘনঘটা বিরাজ করছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, জঙ্গী সমস্যার সাথে একদিকে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে আগামীদিনের বিশ্বমোড়ল চিরবৈরী ভারত অন্যদিকে আঠার মত লেগে থাকা শত্রু আমেরিকা পাকিস্তানের দোরগোড়ায়। আরো রয়েছে ইরান, যার সাথে

৬. *বর্তমান জঙ্গিবাদ, যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ : সরাসরি প্রতিক্রিয়া*, ইমরান খান, বিশেষ সাক্ষাৎকার, তেহরান টাইমস, নয়াদিগন্ত, ২৯ এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ৯।

পাকিস্তানের সম্পর্ক তেমন একটা ভাল নয়; বরং আফগানিস্তানে নিজেদের আঞ্চলিক প্রভাব বজায় রাখতে গিয়ে বাহ্যত তারা শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এখন শুধু বাকী রইল আরেক প্রতিবেশী চীন। এই দেশটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্বকে বজায় রেখে চলছে। সব মিলিয়ে যেন পাকিস্তানের অবস্থা আজ করুণ। এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে পাকিস্তানের জনগণের মাঝে যে ধরনের অটুট ঐক্য দরকার তা যে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। বালুচ গেরিলা এবং সীমান্তবর্তী মুজাহিদদের সাথে সরকারের বিরোধ পাকিস্তানকে চরম হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। বহুমুখী সংকটের এবড়ো থেবড়ো পথে হোঁচট খেতে খেতে পাকিস্তানের অবস্থা ত্রাহিত্রাহি। যার জন্য ভারত ও আমেরিকা বহুদিন যাবৎ অপেক্ষা করছে।

সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই ও প্রকৃত রহস্য : রুশ শাসনের কবল থেকে মুক্ত জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে না নিতেই আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা নিয়ে মুজাহিদ দলগুলো ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সকলেই যখন একটি তৃতীয় পক্ষের অপেক্ষা করছিল, সেই মুহূর্তে ১৯৯০ সালে আফগানিস্তানের মাদরাসার ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয় 'তালেবান' নামক সংগঠন। ছাত্রদের এই সংগঠন অল্পদিনেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং ১৯৯৬ সালে কাবুল দখল করে আফগানিস্তানে একক নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

তালেবান নেতা মোল্লা ওমর ইসলামী আইনের ভিত্তিতে দেশটি পরিচালনায় জন্য নেতৃত্ব দেন। এ সময় পাকিস্তান, সৌদি আরব, আরব আমিরাত তালেবান সরকারকে সমর্থন দেয়। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব এই ইসলামী বিপ্লবকে নিজেদের জন্য পথের কাটা মনে করে বসে। শুরু হল এ বিপ্লবকে নস্যাৎ করতে তাদের নতুন ষড়যন্ত্র।

উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তানের মুজাহিদ গ্রুপগুলো আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল। যাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আল-কায়েদা। ১৯৭৯ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা 'সিআইএ' ওসামা বিন লাদেনকে সরাসরি সহযোগিতা দেয়। তার নেতৃত্বে গড়ে উঠে আল-কায়েদা। পরে সিআইএ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত গেরিলা ট্রেনিং ক্যাম্পে বিন লাদেন প্রশিক্ষণ নেন। এমনকি প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ১৯৮৩ সালে হোয়াইট হাউসে আল-কায়েদা কমান্ডারদের সাথে বৈঠক করেন।[৭] আল-কায়েদাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য হাছিলের পর আমেরিকার কাছে আল-কায়েদার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। অতঃপর তালেবানদের ইসলামী বিপ্লব সফল হলে আল-কায়েদাও তাদের মিত্র হিসাবে কাজ করতে থাকে। এদিকে তালেবানদের উত্থানে শংকিত আমেরিকা যে কোন মূল্যে ক্ষমতা থেকে সরানো এবং মধ্যপ্রাচ্যের পর মধ্য-এশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা আঁটতে থাকে। ২০০১ সালে ৯/১১ এই মোক্ষম সুযোগ এনে দেয় তাদের হাতে। এমতবস্থায় তারা আল-কায়েদাকে নতুন ভূমিকায় দৃশ্যপটে এনে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার অপরিহার্য সঙ্গীতে পরিণত করে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ রাশিয়াকে হারিয়ে নতুন প্রতিপক্ষ হিসাবে মুসলিম বিশ্বকে যখন তারা টার্গেট করে, তখনই আল-কায়েদার মত একটা প্রতীক প্রয়োজন পড়ে। তাই মিডিয়ার মাধ্যমে সুচারুরূপে আল-কায়েদাকে তারা এক যোগ্য প্রতিপক্ষে পরিণত করে। শুধুমাত্র আফগানিস্তানে সীমাবদ্ধ এই সংগঠনটি পশ্চিমা মিডিয়ার নিষ্ঠাবান মিথ্যাচারিতায় আজ এক বিশাল আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। অথচ এর অস্তিত্ব কেবল একটা জুজুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এ জন্যই কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাইকেল চসুদোভস্কি আল-কায়দাকে রহস্যময় বলে উল্লেখ করেন।[৮] সাবেক বৃটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবিন কুক বলেন, 'আল-কায়েদা টায়েদা সিআইএ'র একটা ফাইলের নাম'। আল-কায়েদা তাই 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' তথা সন্ত্রাসবাদের বিনিয়োগে আমেরিকার জন্য এক মূল্যবান পুঁজি। এখন বিশ্বের কোনখানে যে ধরনের বোমা হামলাই ঘটুক না কেন কিংবা যেই করুক না কেন সে হামলার সাথে আঞ্চলিক কোন ইসলামী সংগঠনের নাম দিয়ে তাকে কাল্পনিক নেটওয়ার্ক আল-কায়েদার সাথে জড়িত করার জন্য অপপ্রচার চালানোই পাশ্চাত্য মিডিয়া ও তার পোষ্যদের গুরু দায়িত্ব। এটা লক্ষ্য করে সিআইএ-এর সাবেক গোয়েন্দা বেয়ার্ডম্যান বলেন, সন্ত্রাসবাদ যুক্তরাষ্ট্রের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। এর মাধ্যমে সবকিছুই অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে বৈধ ও অব্যাহত রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রই গোপনে কথিত সন্ত্রাসীদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে।[৯] 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নামের এই বুদ্ধিবৃত্তিক মরণাস্ত্র দিয়েই তারা তালেবানকে ঘায়েল করতে সমর্থ হয়। বলতে দ্বিধা নেই, শুধু তালেবান নয় মুসলিম বিশ্বের যেকোন অগ্রগামী বিপ্লববাদী ইসলামী দলকে ধ্বংস করার জন্য 'আল-কায়েদা'কে সৃষ্টি আমেরিকার জন্য পয়মন্ত হয়েছে। বিগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইহুদী-খৃষ্টান ইউনিয়নের এক অধিবেশনে ২০০২ সালের জানুয়ারীতে বক্তৃতাকালে বলেন, যে সকল আন্তর্জাতিক সংগঠন মার্কিন ও ইসরাঈলী স্বার্থের বিরোধিতা করবে আমরা তাদের উপর হামলা চালাতে কারোরই পরওয়া করব না। চাই তা জাতিসংঘ হোক, আফ্রিকান ইউনিয়ন হোক, আরব লীগ হোক কিংবা ওআইসি হোক বা কোন ইসলামী সংগঠন হোক না কেন।[১০] একথা এখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জর্জ বুশের এই কথার বাস্তব প্রমাণ ইরাক ও আফগানিস্তান। তারা ৯/১১-এর ঘটনার জন্য তাদের বানানো আল-কায়েদাকে দায়ী করে এবং আল-কায়েদা প্রধান ওসামাকে আশ্রয় দেয়ার অভিযোগ করে আফগানের ইসলামী বিপ্লবের নায়ক তালেবান সংগঠন ও তাদের গঠিত সরকারকে ধ্বংস করে। আগেই বলা হয়েছে, আল-কায়েদার সাথে তালেবানের বিস্তর ফারাক রয়েছে। আল-কায়েদা ছিল নিছক একটি মুজাহিদ সংগঠন। কিন্তু তালেবান আফগানিস্তানের একটি বৈধ ও প্রতিষ্ঠিত সরকার ছিল, যাদের জনসমর্থনও ছিল তুঙ্গে।

৭. *পাকিস্তান ভাঙার মার্কিন মহা পরিকল্পনা,* মোতালেব জামালী, নয়া দিগন্ত, ৩ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ.৭।

৮. *ভারতের ৯/১১ : পেছনে কারা?* গ্লোবাল রির্সাচ, মাইকেল চসুদোভস্কি, বঙ্গানুবাদ : ফারুক ওয়াসিফ, প্রথম আলো, ৪ ডিসেম্বর, ২০০৮, পৃ.১২।

৯. *পাকিস্তান ভাঙার মার্কিন মহা পরিকল্পনা,* মোতালেব জামালী, নয়া দিগন্ত, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৮, পৃ.৭।

১০. *গ্লোবালাইজেশন আওর ইসলাম,* ইয়াসীর নাদীম, দারুল কিতাব দেওবন্দ, ভারত। বঙ্গানুবাদ : *'বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্রাটেজী'*, শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রফেসরস পাবলিকেশন্স, মগবাজার ঢাকা, পৃ. ৯২।

বর্তমানেও তালেবানরা আফগান মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত বলে পরিগণিত হচ্ছে। সুতরাং তালেবান ও আল-কায়েদা এক নয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, আমেরিকা যে কথিত সন্ত্রাসী ওসামার নামে পুরো একটি রাষ্ট্র দখল করল এবং অদ্যাবধি সেখানে আধিপত্য বজায় রেখেছে সেই ওসামাকে তারা ৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও ধরতে পারেনি। কেননা ওসামাকে গ্রেফতার করা তাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং তাকে দাবার ঘুটি হিসাবে ব্যবহারই তাদের উদ্দেশ্য। অথবা তিনি হয়ত নিহতই হয়েছেন কিন্তু তারা মিডিয়ার মাধ্যমে ওসামাকে বাঁচিয়ে রেখেছে একটা জুজু হিসাবে। যে জুজুর কারসাজিতে দীর্ঘকাল যাবৎ বিশ্বের যে কোন স্থানে তারা ইচ্ছামত অস্ত্রের মহড়া দিতে পারছে এবং সুবিধা মত স্বার্থ আদায় করে নিচ্ছে।

পাকিস্তানে তালেবানদের উত্থান ও অসন্তোষের কারণ : প্রথমতঃ পাকিস্তানের পাঠান ও পশতুনদের সাথে আফগান পশতুনদের মাঝে নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত ও ধর্মীয় মিল রয়েছে। তাই আফগানিস্তানে তালেবানরা আমেরিকা কর্তৃক আক্রান্ত হলে তাদের প্রতি স্বভাবজাতভাবেই পাকিস্তানীদের সহমর্মিতা জাগে। এই সহমর্মিতাবোধ থেকে সৃষ্টি হয় প্রতিরোধের। তাই যখন তালেবানরা স্বজাতি পাক-পশতুনদের নিকট আশ্রয় নেয় তখন পশতুনরা তাদের শুধু আশ্রয় দেয়া নয় বরং তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মার্কিনবিরোধী যুদ্ধে সহযোগিতা করতে থাকে। সোয়াতে মাওলানা ফযলুল্লাহ ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে বায়তুল্লাহ মেহসুদের নেতৃত্বে পাক-পশতুনরা সমাবেত হয় এবং মার্কিনীদের সহযোগী হওয়ায় পাকিস্তান সরকারেরও বিরোধিতা করে। মূলতঃ পাকিস্তান সরকারের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণই এ অঞ্চলে তালেবানের সশস্ত্র উত্থান ঘটিয়েছে। ইমরান খান তেহরান টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে যথার্থই বলেছেন, 'বর্তমান জঙ্গিবাদ যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সরাসরি প্রতিক্রিয়া। এ যুদ্ধে পাকিস্তানের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ায় পাকিস্তানে সন্ত্রাস ও জঙ্গি বাড়ছে। একে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে সন্ত্রাসের যুদ্ধ। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে। তিনি আরও বলেন, আফগানিস্তানে বোমা বর্ষণ এখানকার পশতুনদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তাদের এই প্রতিক্রিয়াকে দমনের জন্য উপজাতীয় এলাকায় সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। ফলে উপজাতীয় এলাকাগুলোতে জঙ্গিবাদের সূচনা হয়'।[১১]

দ্বিতীয়তঃ আমেরিকা চাইছে যে কোন মূল্যে পাকিস্তানকে তালেবানদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে লাগিয়ে দিতে। রক্তের সংযোগ এবং রুশবিরোধী লড়াইয়ের সূত্র ধরে পাকিস্তানের সরকার, সেনাবাহিনী, সাধারণ জনগণ প্রত্যেকেই তালেবানদের প্রতি দুর্বল। পাকিস্তানের সাথে তালেবানদের সুসম্পর্ক ভাবিয়ে তোলে যুক্তরাষ্ট্রকে। তাই তালেবানদের বিষয়ে তাদের মনোভাব দুর্বল করার জন্য তারা বিভিন্ন স্থানে জঙ্গী হামলায় মদদ যুগিয়ে পাকিস্তানের সাথে তালেবানদের সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তালেবানকে দেশের জন্য হুমকি স্বরূপ দেখিয়ে আমেরিকা জঙ্গী দমনের নামে বহু অর্থ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাকিস্তানকে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' তথা তালেবানদের বিরুদ্ধে নামিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। উদ্দেশ্য হল একদিকে চলমান আফগান-তালেবান বা আমেরিকা-তালেবান সংকটটি পাক-তালেবান সংঘাতে রূপ নেবে এবং এ সুযোগে আফগানিস্তান তালেবানের হাত থেকে নিরাপদ হবে। অন্যদিকে তালেবানদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে পাকিস্তানের সামরিক শক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়বে তখন আমেরিকা ও ভারত মিলে ফাঁক বুঝে পাকিস্তান দখল করবে অথবা নিরাপত্তার আশংকা দেখিয়ে পারমাণবিক বোমাগুলো কার্যত ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে। তাদের সেই পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছে পাকিস্তান। ইতিমধ্যে বুনার, সোয়াতের পর ওয়াজিরিস্তানে পাক-তালেবান সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর এরই মাঝে পাক-তালেবান সংঘাত যদি স্থায়ী রূপ লাভ করে তাহলে পাকিস্তানকে ভাঙ্গার পরিকল্পনা বাস্তব রূপ লাভ করতে মোটেও দেরী হবে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পাক-আফগান সীমান্তবর্তী অঞ্চলকে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করেছেন এবং পাক-আফগান সমস্যাকে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে অভিহিত করেছেন। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি নতুন করে কৌশল নির্ধারণ করেছেন যাতে পাক-আফগানকে একসাথে নিয়ে সমস্যা সমাধানের কথা বলা হয়েছে। এই কৌশলে আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতার জন্য পকিস্তানের স্থিতিশীলতাকে শর্ত করা হয়েছে এবং পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার পথ হিসাবে জঙ্গী দমনকে উল্লেখ করা হয়েছে। তার এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইমরান খান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার উপর আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা নির্ভর করছে বলে ওবামা যে মন্তব্য করেছেন তা মোটেই ঠিক নয়। পাকিস্তানে তো স্থিতিশীলতা ছিলই। জর্জ বুশের কাণ্ডজ্ঞানহীন নীতির কারণে ও অন্যায়ভাবে নির্বিচারে মানুষ হত্যার ফলে আফগান অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে এবং তার এই অন্যায় কর্মকাণ্ডের প্রতি মোশাররফের নগ্ন সমর্থনের প্রভাব পাকিস্তানের উপর পড়ে। কাজেই পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা নির্ভর করছে আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতার উপর। আর আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা নির্ভর করছে আফগান থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের উপর। আফগান থেকে বিদেশী সৈন্য যত দ্রুত প্রত্যাহার করা হবে তত দ্রুত পাক-আফগান স্থিতিশীল হবে এবং জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস দমন হবে'। তিনি অন্যত্র বলেন, পাকিস্তানের মানুষ অন্যায়ের বিচার পায় না। তাই তারা শরী'আহ আইনের দিকে ঝুঁকছে। ফাতিমা ভুট্টো বলেছেন, 'পাকিস্তানের সমস্যা কোন মতেই তালেবান নয়, বরং দুর্নীতি'। আসলে পাকিস্তানে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন সরকারের বড় কোন দায় পড়ে যায়নি। তাদের মূল উদ্দেশ্য আফগানিস্তানকে পুরোপুরি আপন কব্জায় রাখা এবং ভারত, চীন, রাশিয়া, ইরানকে একযোগে পাহারা দেয়া। সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করা। এজন্য পার্শ্ববর্তী পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র পাকিস্তান বিভক্ত ও অস্থিতিশীল হলেই তাদের লাভ। তাই তারা পাকিস্তানকে তালেবানদের সাথে সমঝোতায় যেতে সবসময় নিরুৎসাহিত করে আসছে এবং তালেবানদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাপ দিচ্ছে। এমনকি গত ৯ মে ওয়াশিংটনে শেষ হওয়া ত্রিদেশীয় বৈঠকে আমেরিকা পাকিস্তানের

১১. *বর্তমান জঙ্গিবাদ, যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ : সরাসরি প্রতিক্রিয়া*, ইমরান খান, বিশেষ সাক্ষাৎকার, তেহরান টাইমস, নয়াদিগন্ত, ২৯ এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ৯।

চিরশত্রু ভারতকে বন্ধু হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং তালেবানদেরকে সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে উল্লেখ করে। সাথে সাথে ভারত সীমান্ত থেকে পাকিস্তানী সৈন্য সরিয়ে নিতে চাপ দেয়। যে ভারত বিশ্ববাসীর চোখের সামনে কাশ্মীর নিয়ে আজ অর্ধশতাব্দীকাল ধরে টালবাহানা করছে, হাযার হাযার কাশ্মীরীকে পাখীর মত হত্যা করে সেখানে স্থায়ী মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে রেখেছে। যে ভারত তার দেশের যে কোন দুর্ঘটনায় সরাসরি পাকিস্তানকে দায়ী করে এবং পাকিস্তানের বিপদ মুহূর্তে পাশে দাঁড়ানো তো দূরে থাক বরং ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনায় আমোদিত হয়, সেই ভারত কি কখনো পাকিস্তানের বন্ধু হতে পারে? তাহলে ওবামার এই ধরনের প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে কি? আসলে ওবামারা চান যে, পাকিস্তান ইসলামপন্থী তালেবানদের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক এবং এই যুদ্ধ পাকিস্তানে গৃহ যুদ্ধে রূপ নিক এবং পাকিস্তানকে ভঙ্গুর অবস্থার দিকে ঠেলে দিক। আর সেই মোক্ষম সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সময় বুঝে তারা ভারতকে সাথে নিয়ে পাকিস্তানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। 'পরিবর্তনে'র শ্লোগান নিয়ে ওবামারা বার বার নির্বাচনে জয় ছিনিয়ে আনবেন ঠিকই। কিন্তু তাদের এসব ন্যক্কারজনক ষড়যন্ত্র ইতিহাসের 'পরিবর্তন' সোনার হরিণই থেকে যায়। হয়তবা সাম্রাজ্যবাদী ধারাবাহিকতাকে আরো জোরদার করার সক্ষমতাই ওবামাদের কাঙ্খিত সেই 'পরিবর্তনে'র সূচক !!

সমাধান কোন পথে : মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতিই পাকিস্তানের জন্য বার বার দুর্দশা বয়ে এনেছে। মিঃ গান্ধি ভারতবর্ষের ঐক্য রক্ষার জন্য বলেছিলেন, We are first Indian then we are Hindu or Muslim 'আমরা প্রথমে ভারতীয় তারপর হিন্দু অথবা মুসলিম'। তার উত্তরে মুসলিম লীগ নেতা পাকিস্তানের জনক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন, we are first Muslim then we are Indian 'আমরা প্রথমে মুসলিম তারপর ইন্ডিয়ান'। তাঁর সেদিনের এই বক্তব্য কোন আকস্মিক প্রকাশ ছিলো না বরং তা ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের হৃদয়ের ভাষা। এই ভাষাই অনূদিত হয়েছিল সুপ্রসিদ্ধ দ্বি-জাতি তত্ত্বে। আর এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই সেদিন স্বাধীন পাকিস্তান ও ভারত সৃষ্টি হয়। এই জন্যই তো পাকিস্তানের নামকরণ করা হয়েছিল The Islamic Republic of Pakistan। ১৮০০ মাইল দূরত্বে অবস্থান করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র ইসলামের সূত্রেই দুই পাকিস্তান সেদিন একতাবদ্ধ হতে পেরেছিল। সুতরাং একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপলক্ষ ছিল ইসলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে স্বাধীন পাকিস্তানের উদ্ভব ঘটেছিল পাকিস্তানী শাসনযন্ত্র রাষ্ট্রপরিচালনায় কখনো সেই ইসলামী শরী'আহকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি। সেই সাথে ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন, নেতাদের উন্নাসিকতা, নেতৃত্বের লোভ, অপরিণামদর্শিতা এবং ইহুদী-খৃষ্টানদের লেজুড়বৃত্তির দরুণ ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের আর ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া হয়নি। তাইতো ২৪ বছরের মাথায় পাকিস্তান দুর্ঘটনায় নিপতিত হল। যদি পাকিস্তান ইসলামী আইন যথাযথ অনুসরণ করত, ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সত্যিকার খেলাফতী কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে দায়িত্ব পালন করত তাহলে বাঙ্গালি জাতিকে বঞ্চনার শিকার হতে হত না এবং তাদের অস্ত্র হাতে নেওয়ার প্রয়োজন হত না। আল্লামা ইকবালের নাতি যথার্থই বলেন, 'যেই বাঙ্গালি জাতি আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তান স্বাধীন করেছিল সেই বাঙ্গালী জাতি কম ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলেনি'। এতেও শাসকদের সম্বিত ফেরেনি। অদ্যাবধি তারা একের পর এক বিপর্যয়ের প্রতিকূল স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছেন কিন্তু তাদের আদর্শের কথা ভুলেও মাথায় আনছেন না। তালেবানরা তো কোন অযৌক্তিক, অশ্রুতপূর্ব দাবী তোলেনি। তাদের দাবী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মৌলিক লক্ষ্যের সাথেই সংগতিপূর্ণ। তারা তো তাদের সরকারের বিদেশী শক্তির পদলেহী আচরণের অবসান চেয়েছেন। সরকার ইচ্ছা করলেই তালেবান বিদ্রোহীদের সাথে এ নিয়ে আলোচনায় বসতে পারত। কেননা তারা বহির্দেশীয় কোন বর্গী নয়। তারা তো দেশেরই নাগরিক। দেশের বিপদে এরাই তো আবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ভারত, আমেরিকার মত সুস্পষ্ট শত্রুর সাথে যদি আলোচনা করতে অসুবিধা না হয়, তবে স্বদেশী তালেবানদের সাথে আলোচনা, সমঝোতায় বাধা কোথায়? এ কথা অতি সত্য যে, পাকিস্তান যদি তার প্রতিষ্ঠাকালীন কক্ষপথে ফিরে যায় এবং ইসলামী শরীআহ বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয় তাহলে বালুচিস্তান, ওয়াজিরিস্তান থেকে শুরু করে সোয়াত, কাশ্মীর সহ পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ সরকার ও সেনাবাহিনীর সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একাত্মতা ঘোষণা করবে। পাক জনগণ, সরকার ও সেনাদের এই ঈমানী ঐক্য ও সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণের আকুণ্ঠ সমর্থন ও ঐকান্তিক ভালবাসায় যে মহাবিপ্লব শুরু হবে সেই বিপ্লবে নিমিষে শুধু সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ ভেসে যাবে না, ভেসে যাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত ও সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সকল হুমকি ও ষড়যন্ত্র ইনশাআল্লাহ। পাকিস্তানের একতা, সংহতি, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাই মূল আদর্শের দিকে ফিরে যাওয়াই একমাত্র পথ। সকল বাধা-বিপত্তি ও অর্থনৈতিক অবরোধকে উপেক্ষা করে আজও যদি ইরান টিকে থাকতে পারে তাহলে পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তান পারবে না কেন? আসল সমস্যা হচ্ছে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহভীরু, সৎসাহসী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী একজন শাসকের অভাব, যিনি পকিস্তানকে স্বীয় লক্ষ্যপানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এবং জনতাকে সাথে নিয়ে দুর্জয় সাহসের সাথে শত্রুদের ষড়যন্ত্র মুকাবিলা করবেন। পাকিস্তানের ভাগ্যাকাশে সেইরূপ কোন সূর্য উদিত হওয়ার দূরূহ প্রত্যাশা নিয়ে এখনো অপেক্ষা করছে পাকিস্তানীরাসহ মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণ।

উপসংহার : পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি মুসলিম বিশ্বে বিশেষ মর্যাদায় সমাসীন। উম্মাহর বিভিন্ন সংকটে পাকিস্তানের ভূমিকা সমুজ্জ্বল। তাছাড়া একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে পারমাণবিক শক্তিধর হওয়ায় পাকিস্তান বিশ্বের মুসলমানদের আশা-ভরসারও প্রতীক। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মোটামুটি অগ্রসর এ দেশটি এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়েও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ একটি মুসলিম রাষ্ট্র আজ সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়াল থাবায় ক্ষত-বিক্ষত। একদিকে অর্থনৈতিক সাঁড়াশী বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ পাকিস্তানের গলায় শক্ত ঋনের ফাঁস পরিয়ে দিয়ে ক্রুর হাসি হাসছে, অন্যদিকে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নামক ভয়ানক সংহারী তোপ তার দিকে নিশানা করে রয়েছে। পাকিস্তানের এহেন সংকট মুহূর্তে মুসলিম বিশ্ব কি কোনরূপ পদক্ষেপ নিচ্ছে? তারা কি বিগত দিনের মত আজও বেহুঁশ হয়েই পড়ে থাকবে? নখদন্তহীন ওআইসির কি কোন দিনই উম্মাহর প্রয়োজনে সামান্য ভূমিকাও রাখার সুযোগ হবে না? আর কতকাল আমাদের পশ্চিমা বিশ্বের কদমবুচি করে চলতে হবে? কতকাল তাদের করুণার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে? কবে হবে ন্যাটোর মত একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সেনাবাহিনী, যেই সেনাবাহিনী প্রতিটি মুসলিম দেশসহ মযলূম জনতার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে হবে বদ্ধপরিকর? কতকাল বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর কাছে ভিক্ষা করে যেতে হবে? কবে আসবে পূর্ণাঙ্গ সূদমুক্ত ইসলামী অর্থনীতি, যার হাতে জনসাধারণের জান-মাল, সহায়-সম্পদ থাকবে নিরাপদ? আল্লাহ আমাদের শাসকদের সুমতি দিন এবং তাদের হেদায়তর পথ সুপ্রশস্ত করুন। আমীন!!

বাংলাদেশে ইসলাম : প্রাচীন ও মধ্যযুগ

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

প্রাথমিক পরিচিতি :

অবস্থান : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ স্থলে ৪,২৪৬ কি. মি. সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং মায়ানমার দ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণে ৭১৪ কি. মি. দীর্ঘ উপকূল জুড়ে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।

মুসলিম বিশ্বে অবস্থান : ওআইসির ১৪তম এই দেশটি জনসংখ্যার বিচারে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ৩য় বৃহত্তম এবং আয়তনের দিক থেকে ৩৭তম স্থানে অবস্থান করছে।

আয়তন ও ভূ-প্রকৃতি : নদীমাতৃক এ দেশটি ভূখণ্ডের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. (৫৬,৯৮০ বর্গ মাইল)। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত দেশটির মধ্যাঞ্চল দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। প্রায় সমগ্র দেশটি নদীবিধৌত পলি দ্বারা সৃষ্ট এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। জালের মত নদ-নদী, খাল-বিলে ছেয়ে থাকা এরূপ বিশাল ও উর্বর শস্য-শ্যামলা সমতলভূমি পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখা যায় না। উত্তর পশ্চিমাংশের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ধূসর ও লাল বর্ণের মাটি গঠিত উচ্চভূমি বরেন্দ্র ও মধুপুর ভাওয়ালের গড় অঞ্চল। উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে রয়েছে তৃণবেষ্টিত নয়নাভিরাম পাহাড়ী অঞ্চল। দক্ষিণাঞ্চলের এক বিরাট এলাকা জুড়ে (৫৫৭৫ বর্গ কি.মি.) অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন।

জনসংখ্যা ও শিক্ষার হার : প্রায় ১৬ কোটি (১৫ কোটি ৫৯ লাখ ৯১ হাযার) জনসংখ্যার এই দেশটি বিশ্বের ৭ম জনবহুল দেশ। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০৫৫ জন বাস করে। জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে খুব ছোট কয়েকটি দেশ বাদ দিলে এ দেশটি অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। যার ৬০% হল অনূর্ধ্ব ২৫ বছর বয়সী এবং মাত্র ৩%-এর বয়স ৬৫-এর উর্ধ্বে। শিক্ষার হার ৪৯.০৭%।

ভাষা : ৯৮% বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাকী ২% হল উর্দূভাষী বিহারী এবং নিজস্ব ভাষাভাষী উপজাতি।

স্বাধীনতা: ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভের পর অখণ্ড পাকিস্তানের অংশ হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৮০০ কি. মি. দূরত্বে থেকে দেশটি পাকিস্তানের ৫টি রাজ্যের একটি ছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নয় মাসব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে।

ধর্ম : মুসলিম অধ্যুষিত দেশটিতে জনসংখ্যার শতকরা ৮৯.৭% মুসলিম (বিভাগ অনুযায়ী গড় পরিসংখ্যান- বরিশাল ৮৮%, চট্টগ্রাম ৮৪%, ঢাকা ৯০%, খুলনা ৮২.৮৭%, রাজশাহী ৮৬.৮৪% ও সিলেটে ৮১.১৬%)। এছাড়া হিন্দু ৯.৩%, বৌদ্ধ ০.৭%, খৃষ্টান (অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক) ০.৩%। শহরাঞ্চলে বিহারী গোষ্ঠীভুক্ত শী'আ এবং কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক অনুসারী রয়েছে। পাহাড়ী অঞ্চলে চাকমা, মারমা, ম্রো প্রভৃতি উপজাতিরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। কুকি, খুমী ইত্যাদি উপজাতি প্রকৃতিপূজারী।

সরকার কাঠামো : সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে। পাঁচ বছর পর পর নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান হলেও সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশাসনিক কাঠামো : দেশে ৬টি প্রশাসনিক বিভাগ রয়েছে যা ৬৪টি জেলা পরিষদে বিভক্ত। প্রশাসনিক উপজেলা রয়েছে ৪৭৬টি। থানা রয়েছে ৫০৩টি।

বিচারবিভাগ : বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট যার দুটি শাখা হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ। অধস্তন আদালত রয়েছে আরো ৬টি। ক. ফৌজদারী আদালত, খ. দেওয়ানী আদালত, গ. সালীশী বোর্ড, ঘ. গ্রাম্য আদালত, ঙ. পারিবারিক আদালত, চ. কিশোর আদালত।

অর্থনৈতিক অবস্থা : বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ। জিডিপির হার ১২৩০ ডলার যেখানে আন্তর্জাতিক হার ১০,২০০ ডলার। জনগণের মাথাপিছু আয়ের গড় বর্তমানে ৬৯০ ডলার বা ৪৭,৩৭৩ টাকা। দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে দেশের ৫ কোটি ৬০ লাখ (প্রায় ৪০%) মানুষ।[১]

ঐতিহাসিক ক্রমধারা

প্রাগৈতিহাসিক কাল :

নৃতাত্ত্বিক : বাংলাদেশের আদি ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য তেমন পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয় পাঁচ ছ হাযার বছর পূর্বে এখানে জনবসতি শুরু করে নেগ্রিটো, দ্রাবিড়, তিববতী-মোঙ্গল ও অষ্ট্রো-এশিয়াটিক (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাভা দ্বীপ ও ইউরোপের আল্পস অঞ্চল থেকে আগত) মানবগোষ্ঠী। তাদের বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত আধো আধো ভাষার সম্মিলিত রূপই আদি বাংলা ভাষার অলিখিত রূপ। তখন বঙ্গোপসাগরের তটরেখা ছিল ঢাকা শহরের উত্তর সীমানা স্পর্শ করে পশ্চিমে রাজশাহী বিভাগের দক্ষিণ সীমানা ধরে বায়ে ঘুরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের অববাহিকা অঞ্চল হয়ে বর্তমানকালের গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত প্রলম্বিত। হিমালয়ের পাদদেশস্থ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের হরিকেল (চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম), উত্তর পশ্চিমে পুন্ড্র-বরেন্দ্র-গৌড়-বঙ্গ (রাজশাহী ও বিহারের কিয়দংশ) এবং দক্ষিণে রাঢ়-কলিঙ্গ (উড়িষ্যার কিয়দংশ) নিয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতির এ ভূভাগ ছিল প্রায় জনশূন্য অরণ্যভূমি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে মানুষ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করত না। খৃষ্টপূর্ব দেড় হাযার বছর পূর্বে ইউরোপের আলপাইন ও রাশিয়ার ইউরাল পার্বত্য অঞ্চল থেকে বৈদিক আর্যরা (অর্থ-যাযাবর। প্রাচীন ককেশীয় জনশ্রেণীর প্রাচ্য শাখার কোন বিচ্যুত শাখাগোত্রের উত্তর বংশধর, যারা স্মরণাতীতকালে মধ্যএশিয়া থেকে এসে ইরানে যাযাবর জীবন যাপন করত) খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করে। তারও ১৪০০ বছর পর তারা বাংলায় প্রবেশ করে। খৃষ্টীয় ৭ম-৮ম শতাব্দীতে আরবদের আগমনের পর সেমীয় রক্তধারাও বাঙ্গালি জাতির সাথে সংমিশ্রিত হয়। তাই বর্তমান বাঙালি জাতি অষ্ট্রিক দ্রাবিড় আর্য মঙ্গোলীয় সেমীয় নিগ্রো

১. জাতিসংঘের মতে, দারিদ্রসীমা হল প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দৈনিক উপার্জনের গড় ১ ডলারের নিচে হওয়া। আর আয়ের গড় ২ ডলারের নীচে এমন লোকের সংখ্যা দেশে বর্তমানে ৭৮%-এরও বেশী।

ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর রক্তধারার সংমিশ্রণে এক বিচিত্র জনসমষ্টি হিসাবে বিদ্যমান।

সাংস্কৃতিক : আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সাধারণ্যে স্বীকৃত ছিল। আর্যরা আগমনের মাধ্যমে বৈদিক ধর্ম অত্র অঞ্চলে ভিত্তি লাভ করে। প্রথম অবস্থায় তারা দেবতায় বিশ্বাসী হলেও পৌত্তলিক ছিল না। পরবর্তীতে উপনিষদের ভিত্তিতে 'ব্রহ্ম উপাসনা' শুরু হলে মুনী-ঋষিদের দেবধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মর্মানুসারে প্রতীক পূজার প্রচলন ঘটে। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মানুসারীদের মধ্যে ধর্ম হিসাবে নয় বরং তান্ত্রিক আচরণ ও কিংবদন্তিক কাহিনী ভিত্তিতে বৈদিক বা হিন্দু ধর্ম প্রসার লাভ করে এবং পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্যবাদের ব্যাপক যাজকীয় নীতি পদ্ধতির দ্বারা এই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দান করা হয়। একেশ্বরবাদী জীবনদর্শন এখানে উপস্থিত ছিল কিনা তা নিশ্চিত অবগত হওয়া না গেলেও হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের কিছু বর্ণনায় ধারণা পাওয়া যায় যে, তারা কোন এক কালে তাওহীদী দা'ওয়াতের সংস্পর্শে এসেছিল। নৈতিক ও চারিত্রিক দিক দিয়ে এ সময় অধঃপতনে ডুবে ছিল বাংলার প্রাচীন সমাজ। ধর্ম, দেব-দেবীদের কেন্দ্র করে এক চরম অন্ধকারাচ্ছন্ন কার্যক্রমে লিপ্ত ছিল মানুষ। মদ, নৃত্য-গীত, অশ্লীলতা, যেনা-ব্যভিচার ইত্যাদি ছিল খুবই নৈমিত্তিক। বাংলা ভাষার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদে এসবের অস্তিত্ব ব্যাপকাকারে বর্ণিত রয়েছে। দেব-দেবীর অশ্লীল মূর্তি নির্মাণ শিল্প ও পরবর্তীকালে রচিত রুচি বিবর্জিত সাহিত্যে এ অধঃপতনের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে।

রাজনৈতিক : খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণকালে বাংলায় গঙ্গারিডই (বর্তমান ঝিনাইদহের কাযীগঞ্জ উপযেলার বারোবাজার ছিল যার রাজধানী বলে কথিত আছে) নামে একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল বলে গ্রীক লেখকদের বিবরণে পাওয়া যায়। এটিই ইতিহাসে পাওয়া এ অঞ্চলের প্রথম সাম্রাজ্য। পরবর্তীতে এটি বিহারের মগধ, নন্দ, মৌর্য এবং সুঙ্গ সাম্রাজ্যের সাথে একত্রিত হয়ে যায়। ৩০০ থেকে ৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মৌর্য, সুঙ্গ, গুপ্ত ও হর্ষবর্ধন বংশ বঙ্গদেশ শাসন করে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলার সর্বপ্রথম স্বাধীন রাজা হন শশাঙ্ক। বঙ্গদেশ তখন গৌড় হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ সময়ই আরবের বুকে ইসলামের বার্তা নিয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ) আগমন করেন। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী ১০০ বছর চরম অরাজকতা ও বিশৃংখলাপূর্ণ। এজন্য এ সময়কালকে ইতিহাসে 'মাৎসন্যয়' বলা হয়েছে। অতঃপর ৭৫০ সাল থেকে পরবর্তী ৪০০ বছর বাংলা শাসন করে বৌদ্ধ পাল বংশ। পাহাড়পুরের বিখ্যাত সোমপুর বৌদ্ধবিহার এ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শাসনামলের শেষদিকে হিন্দু সেন বংশ বাংলার রাঢ় অঞ্চলে সেনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমান মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুর ছিল তখন বাংলার রাজধানী। সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেন ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজী অকস্মাৎ আক্রমণ করলে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন এবং সেখানে কিছুকাল রাজত্বের পর ১২০৬ সালে প্রাণত্যাগ করেন। এরপর বাংলায় শুরু হয় মুসলিম শাসনামল। সংস্কৃত 'বঙ্গ' শব্দটি 'বঙ্গালহ' রূপান্তরিত হয়ে ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের সময়ে দেশবাচক পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশে ইসলাম :

প্রেক্ষাপট :

ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই আরব বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোতে যাতায়াত করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি এ উপমহাদেশের আদি নাম সিন্দ ও হিন্দ পর্যন্ত আরবদের দেওয়া। আরব বণিকরা মালাবার হয়ে চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন। চট্টগ্রাম ও মেঘনা তীরের চাঁদপুর ছিল নদীবন্দর। এখান থেকে তারা চন্দন কাঠ, মসলা, সূতী কাপড় ইত্যাদি ক্রয় করে নিয়ে যেতেন। ইতিহাসে এসেছে ঈসা (আঃ)-এর জন্মের কয়েক হাযার বছর আগ থেকে দক্ষিণ আরবের সাবা (কুরআনে বর্ণিত) কওমের লোকেরা এই উপমহাদেশে পাল তোলা জাহাজে করে আসত। তার নিদর্শন তাদের প্রতিষ্ঠিত ঢাকা জেলাস্থ সাভার (সাবা-দের উর বা নগর) বন্দর। এছাড়া বাররুল হিন্দ (ইন্ডিয়ার ভূখণ্ড) বা বরেন্দ্র ভূমির কথা তো সর্বজনবিদিত। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ট শতাব্দীতে ইরানের সম্রাট সাইরাস (যুলকারনাইন) উপমহাদেশে আর্যদের অন্যতম রাজ্য গান্ধারা জয় করেন। এ সময় তার তাওহীদী জীবন দর্শনের ছটা এ

অঞ্চলব্যাপী পরিবাহিত হয়েছিল। যার পরোক্ষ প্রভাব পরবর্তীকালে সংঘটিত ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিল বলে ধারণা করা হয়।

বাংলায় ইসলামের আগমন :

ঐতিহাসিকদের মতে উপরোক্ত প্রেক্ষিতে হিজরী ১ম শতকেই আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমেই এদেশে প্রথম ইসলামের আগমন ঘটে। বাণিজ্যের পাশাপাশি সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে তারা ইসলাম প্রচার করেছিলেন। যার মধ্যে বাংলাদেশও ছিল। চীনের ক্যান্টন সমুদ্রতীরে অবস্থিত সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক বিন ওহাইবের মসজিদ ও কবর সে সাক্ষ্যই দেয়। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে সন্দীপ, রামুসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বণিক ও মুবাল্লিগরা ইসলাম প্রচার করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালীন আরব লেখকদের বর্ণনায় সামরূপ (কামরূপ-আসাম) ও রাহমি রাজ্যের কথা এসেছে, যা ৮ম-১২শ শতাব্দীর পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজশাহী পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার ও কুমিল্লার ময়নামতিতে প্রাথমিক আব্বাসীয় যুগের মুদ্রা পাওয়া গেছে। সম্প্রতি লালমণিরহাটে (সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের মজদের আড়া গ্রামে) ৬৯ হিজরীতে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। উপকূলীয় চট্টগ্রাম (شاطئ الغنج-গঙ্গা উপকূল) ও নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানের নাম ও ভাষায় আরবী অপভ্রংশের প্রচুর উপস্থিতি এসব নিদর্শনকে আরো সপ্রমাণিত করে। চট্টগ্রামে ঐ সময় একটি মুসলিম রাজ্যও স্থাপিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, হিজরী প্রথম শতকেই বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটেছিল।

তবে ঐ সময় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এতদঞ্চলে যারা আগমন করেন তাদের পরিচয় সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। পরবর্তীকালে আগতদের মাত্র কয়েকজনের নাম জানা যায় যারা মূলতঃ মধ্যএশিয়া ও পারস্য থেকে এ দেশে আগমন করেন। শাহ মুহাম্মাদ সুলতান বলখী (১০৪৭খৃ.-বগুড়ার মহাস্থান), শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রূমী (১০৫৩ খৃ-নেত্রকোনা), বাবা আদম শহীদ (১১১৯খৃ-মুন্সীগঞ্জ), শাহ মখদুম রুপোশ (১২৮৯খৃ.-রাজশাহী), শাহ নিয়ামত উল্লাহ বুতশিকন (১১২০ খৃ. ঢাকা), জালালুদ্দীন তাবরীযী (১২০৫খৃঃ), তাকীউদ্দীন আল-আরাবী (১২৫০খৃঃ-ধামুরাইরহাট,নওগাঁ), শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (১৩০০ খৃঃ- সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ), শাহজালাল (১৩০৩-সিলেট) প্রমুখ মুবাল্লিগের নাম ইতিহাসে এসেছে যাদের দা'ওয়াতী তৎপরতায় বর্ণবৈষম্যে অত্যাচারিত ও শাসক নিপীড়নে বিপর্যস্ত হিন্দু ও বৌদ্ধরা ব্যাপকহারে দলে দলে ইসলামের শান্তি ও ন্যায় বার্তা গ্রহণ করেছিল। শুধু তাই নয় এ সময় অনেক শাসক ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারে ব্যাপক সহযোগিতা করেন। আবার অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করে মুবাল্লিগদের বিতাড়িত করার জন্য অস্ত্রধারণ করেন। অনেক মুবাল্লিগ এ সময় তাদের হাতে প্রাণ হারান, যাদের মধ্যে বাবা আদম শহীদের নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় মুবাল্লিগ ও নওমুসলিমরাও সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে এসব রাজাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৩০৩ সালে বিখ্যাত শাহজালাল ইয়েমেনী (রহঃ) ৩৬০ জন সঙ্গীসহ রণপ্রস্তুতি নিয়েই দিল্লি থেকে সিলেটে আগমন করেছিলেন এবং অত্যাচারী রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করেন। তাঁর উন্নত চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলার হাজার হাজার হিন্দু-বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

বৈশিষ্ট্য :

১ম ও ২য় শতাব্দীতে আগত আরব বণিক ও মুবাল্লিগরা ছিলেন তাবেঈ, তাবে' তাবেঈ। এজন্য সে সময় ইসলামের মৌলিক রূপটাই যে জনগণের মাঝে প্রস্ফূটিত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যায়, এ সময়ে এতদঞ্চলে হাদীছের চর্চা ছিল। কিন্তু ২য় শতাব্দীর পর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে নিগৃহীত এবং দরবেশদের কারামত ও উন্নত চরিত্রে আকৃষ্ট বৌদ্ধ ও হিন্দুরা ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ করায় মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের অবক্ষয় শুরু হয়। প্রয়োজনীয় দাঈ'র অভাবে ধর্মান্তরিত বিপুল সংখ্যক মুসলমানদেরকে ইসলামের দীক্ষা পুরোপুরি আয়ত্ব করানো সম্ভব না হওয়ায় তারা স্থানীয় সংস্কৃতির মিশ্রযোগে ইসলামের মধ্যে এমন বহু বিষয় সংযুক্ত করে ফেলে যা তার মৌলিক আক্বীদাবিরোধী। অপরদিকে মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক গোলযোগের সূত্র ধরে ইরাকের কূফা, বসরা এবং পারস্যসহ বিভিন্ন স্থানে নব মুসলিমদের মধ্যে 'বাতেনী', 'ছূফী' দলের আবির্ভাব ও সেখান থেকে আগত মরমী ছুফী-সাধকগণের ঈমান-আক্বীদাবিরোধী দা'ওয়াত ইসলামী আক্বীদার প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। নবম শতাব্দীতে প্রথমে শী'আ পরবর্তীতে খৃষ্টীয় মতবাদ, গ্রীক-হেলেনিস্টিক ও নেওপ্লাটোনিক দর্শন, মানিবাদ, পারসিক জরোথুস্ত্রীয় ধর্ম, ইন্ডিয়ার হিন্দু ও বৌদ্ধ চিন্তাধারার সংযোগে সৃষ্ট সর্বেশ্বরবাদী 'ছূফী' নামধারী মরমী সন্ন্যাসতন্ত্র [২] দ্বাদশ শতকের পর মুসলিম মননশীলতাকে ব্যাপকভাবে গ্রাস করে নেয়। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম সর্বত্র ছূফীবাদের প্রভাব অপ্রতিহত হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির সাথে তুর্কী, ইরানী, আফগান, পাঠান, মোঙ্গল এবং স্থানীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শন ও আচারের মিথস্ক্রিয়ায় অজ্ঞতায় নিমজ্জিত বাংলার মুসলিম সমাজ কুরআন ও হাদীছের উপর ভিত্তিশীল মূল ইসলামের পরিবর্তে লৌকিক ইসলাম চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল। তাই এ কথা দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, মধ্যএশিয়া থেকে উত্তর ভারত হয়ে বাংলায় আগত তুর্কী-ইরানী ছূফী-দরবেশ ও মরমী সাধকরা এ দেশে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখলেও তাদের প্রচারিত ইসলাম মূল আরবীয় ইসলাম থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে মুসলিম সমাজে ব্যাপকহারে ইসলামী আক্বীদা বিরোধী বিজাতীয় কালচার, দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। যদিও পৌত্তলিকতাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন ও দেবমূর্তি ধ্বংস সাধন এবং বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ বাহ্যিকভাবে তাদের মুসলিম পরিচয়কে অন্যদের থেকে স্পষ্টভাবেই পৃথক করে রেখেছিল; তবে তাতে তাদের অন্তরের গহীনে লুকানো মূর্তিটি ধ্বংস হয়নি। অবশ্য এ সময় সোনারগাঁও-এর বিখ্যাত মুহাদ্দিছ শরফুদ্দীন আবু তওয়ামা ও তাঁর ছাত্রদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইসলামের প্রকৃত বার্তা কিছুটা হলেও প্রচারিত হয়েছিল।

রাজনৈতিক বিজয় পর্ব (১৪০৪-১৭৫৭)

প্রেক্ষাপট :

৭১২ খৃষ্টাব্দে বীরযোদ্ধা মুহাম্মাদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষে ইসলামের নবযাত্রা শুরু করে। মুলতানকে কেন্দ্র করে তিনি সিন্ধুতে ইসলামী শাসনব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। এর সুদীর্ঘ ৩০০ বছর পর মুসলমানরা দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযান শুরু করে। গজনীর সুলতান মাহমূদ ১০০০ খৃ. থেকে শুরু করে ১০২৭ খৃ. পর্যন্ত খাইবার

২. মরমীবাদ হল একটি অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য মানসিক ক্রিয়া যা প্রত্যেক ধর্মের অন্তর্নিহিত ব্যাপার। সকল সংস্কৃতিতে ও মানুষের সকল যুগের ইতিহাসে এর উদ্ভব হতে দেখা যায়।

গিরিপথ অতিক্রম করে মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন এবং প্রত্যেকবারই বিজয় লাভ করেন। তন্মধ্যে ১০২৫-২৭ সালের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির বিজয় ছিল এক দুঃসাহসিক ঘটনা, যা ভারতবর্ষে হিন্দুত্ববাদের প্রতিপত্তি হ্রাস করে দেয় এবং উপমহাদেশে ইসলামের দুয়ার অবারিত করে দেয়। তারপর অতিক্রান্ত হয় আরো ১৫০ বছর। গজনীর ঘোরী বংশের অসম সাহসী বীরপুরুষ মুহাম্মাদ ঘোরী ১১৭৫ সালে ভারতবর্ষে আবার ব্যাপক অভিযান শুরু করেন। অসাধারণ রণকৌশল প্রদর্শন করে একে একে পাঞ্জাব, সিন্ধু জয় করে তিনি ১১৯২ সালে এক বিরাট যুদ্ধের পর উত্তর ভারতের দিল্লী পর্যন্ত বিজয় সম্পন্ন করেন। অতঃপর কুতুবুদ্দীন আইবেক দিল্লীতে প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী তুর্কী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১২০৪ সালে তারই প্রতিনিধি হিসাবে বখতিয়ার খিলজী বিহার ও বাংলা জয় করেন।

বাংলার স্বাধীন মুসলমান শাসনামল ও পরবর্তীকাল :

প্রথম দেড়'শ বছর বাংলা দিল্লির শাসনাধীনে থাকার পর ১৩৩৬ সালে ফখরুদ্দীন দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সোনারগাঁও-এ রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর ১৩৪২ সালে ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলা দখল করেন এবং শামসুদ্দীন (দ্বীনের সূর্য) উপাধি নিয়ে স্বাধীন বাংলার প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শতবর্ষব্যাপী শাহ বংশের শাসনের পর ১৪৯৩ সালে হোসেনশাহী বংশ শাসনক্ষমতায় আসে। ১৫৩৮ শূরী বংশের শেরশাহ বাংলা দখল করেন। ১৫৭৬ সালে মোঘল বাদশা আকবর পুনরায় বাংলাকে দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কিন্তু প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত এ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এই সুযোগে বাংলার জমিদাররা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে নিজেদের জমিদারীতে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাদের আমলে বাংলাদেশ 'বারো ভুঁইয়া মুলুক' হিসাবে অভিহিত হত। ঈসা খান ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী জমিদার (ভৌমিক)। ১৬০৮ সালে সুবাদার ইসলাম খাঁ কার্যভার গ্রহণ করে মোগল শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার আমলেই ১৬১০ সালে ঢাকায় (জাহাঙ্গীর নগর) সুবে বাংলার রাজধানী স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে মীরজুমলা ও শায়েস্তা খানের দক্ষ শাসনামলে বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয়। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মোগল শাসনের দুর্বল সময়ে শী'আ বংশোদ্ভূত ধর্মপরায়ণ ও সুশাসক মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তার মাধ্যমেই শুরু হয় বাংলায় নবাবী আমল। ১৭৪০ সালে আরব ও তুর্কী রক্তবাহী সুশাসক আলীবর্দী খাঁ এক যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার নবাবী দখল করেন। তার মৃত্যুর পর ১৭৫৬ সালে দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা মাত্র ২৩ বছর বয়সে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলায় বাণিজ্যকুঠি স্থাপনকারী মোগলদের কৃপাভাজন ইংরেজদের সাথে তার মুকাবিলা শুরু হয়। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তারা প্রকাশ্যে জড়িয়ে পড়লে এবং কলকাতায় দূর্গ নির্মাণ শুরু করলে স্বাধীনচেতা সিরাজুদ্দৌলা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে ইংরেজরা সাময়িক আত্মসমর্পণ করে নিজেদের রক্ষা করলেও শুরু করে সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সিরাজুদ্দৌলার সেনাধ্যক্ষদের কয়েকজন এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। অবশেষে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে ৩০০০ ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হন সিরাজুদ্দৌলা। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর তিনদিনের মাথায় পরিকল্পনা মাফিকভাবে সেনাপতিদের নির্লিপ্ততায় সিরাজুদ্দৌলা পরাজয় বরণ করলেন এবং পরিবারসহ পলায়ন করলেন। ৩০ জুন তিনি ধরা পড়েন এবং ২ জুলাই শৃংখলিত অবস্থায় নতুন নবাব মীরজাফরের দরবারে আনীত হন। সে রাতেই মীরজাফর পুত্র মিরণের নির্দেশে সিরাজ তার অনুগ্রহভাজন মুহাম্মদী বেগের ছুরিকাঘাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। এভাবে মর্মন্তুদ বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসতার মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯০ বছরের জন্য ইংরেজদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ল এবং সুদীর্ঘ ৫৫৪ বছরের মুসলিম শাসনের পতন ঘটল।

বৈশিষ্ট্য :

মুসলিম শাসকবৃন্দের হাল-চাল : ১২০৪ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে মুসলিম শাসকরা শাসনকার্য পরিচালনা করায় ইসলাম বাংলার অন্যতম প্রধান ধর্মে পরিণত হয়। বখতিয়ার খিলজী থেকে শুরু করে পরবর্তী শাসকদের অধিকাংশই ছিলেন ধর্মানুরাগী। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের মত ধর্মপরায়ণ ও দক্ষ শাসকগণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ ও মাদরাসা গড়ে তোলেন। ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে প্রতিটি মসজিদে তারা মক্তবের ব্যবস্থা করেন। ইসলামী বিচারব্যবস্থাও অনেকাংশে তারা অনুসরণ করতেন। তবে খোলাফায়ে রাশেদার অনুশীলিত ইসলামী শাসনতন্ত্র ধারা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণের তাকীদ শাসকগণ অনুভব করেননি। ফলে ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের অনুসরণ করলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনগণের মাঝে ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে ভূমিকা রাখার প্রয়োজন ছিল তাতে তারা ছিলেন ব্যর্থ। চৌদ্দ ও পনের শতকে ইসলাম প্রচারের জন্য এ দেশে বহু ছূফী-সাধকের আগমন ঘটে। বাংলার আনাচে-কানাচে তারা মসজিদ, খানকাহ ও ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, তের ও চৌদ্দ শতকে যেখানে এ দেশে ১৩ টি মসজিদ ছিলো সেখানে পনের ও ষোল শতকে ১৪১টি মসজিদ নির্মিত হয়। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য উপমহাদেশে বাংলাই ছিল সর্বাধিক ছূফীর আবাসস্থল। কতিপয় ন্যায়নিষ্ঠ ছূফী শাসকদের সহযোগিতায় মুজাহিদ হিসাবে সশস্ত্রভাবে শত্রুদের মোকাবিলা করে বাংলায় মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। বাংলার শাসকরা ছিলেন এই ছূফী ধর্মপ্রচারকদের উদার পৃষ্ঠপোষক। তাদেরকে যে কোন স্থানে বিনা ভাড়ায় পরিভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল। রাজদরবারে তাদের যথেষ্ট কদর ও ভক্তি করা হত।

মুসলিম শাসকরা অমুসলিম প্রজাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বাধা দিতেন না তা যতই রুচিবিগর্হিত হোক না কেন। বরং তাদেরকে উদারভাবে সর্বোচ্চ সহযোগিতাই করে গেছেন। এর পিছনেও সম্ভবতঃ ছূফীবাদী সম্প্রদায়ের প্রভাব কাজ করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত, রামায়ণ, ভগবৎ গীতা ইত্যাদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়। এজন্য হিন্দু লেখকরা তাকে 'কৃষ্ণ অবতার','বাংলার আকবর' ও 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' বলে প্রশস্তি গেয়েছেন। তার সময়ই ইসলামের প্রসার রোধের জন্য শ্রী চৈতন্যদেব সারা বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রাথমিকভাবে হুসাইন শাহের অতি উদারতার সুযোগে এ কাজটি তিনি নির্বিঘ্নে করতে সক্ষম হন। যদিও শেষ পর্যন্ত হুসাইন শাহ ও আলেমগণ সতর্ক হয়ে গেলে হিন্দুদের এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়। কিন্তু এর প্রভাব মুসলিম সমাজে শোচনীয় অধঃপতনের সূচনা করে। আউল, বাউল, সহজিয়া ইত্যাকার উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত নেড়া মরমীবাদী ভিক্ষুকের প্রভাবে মুসলিম সমাজের অনেক মানুষ প্রভাবিত হয়। কীর্তিকলাপের দিক দিয়ে এসব মুসলমান নামধারী মারেফতি ফকিররা বৈষ্ণব বা চৈতন্য সম্প্রদায়ের মুসলিম সংস্করণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুসলিম সুলতানদের কৃপায় বাংলা সাহিত্য চর্চার ব্যাপক অগ্রগতি শুরু হলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবন হিন্দুদের সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে একাকার হয়ে যায়। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো বাংলা ভাষায় অনূদিত হলেও একই সময়ে মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ আরবী ও ফারসী থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত হয়নি। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে একচেটিয়া হিন্দুয়ানী আধিপত্য বিস্তার মুসলিম চিত্তমানসকে বিজাতীয় সংস্কৃতির গরলে দ্রবীভূত করে ফেলে। স্বতন্ত্র জাতীয় সংস্কৃতি বিনির্মাণে একেবারেই পিছিয়ে পড়ে বাঙালী মুসলমানরা।

মুসলিম সমাজ : প্রাথমিক পর্বে উপমহাদেশের মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করলেও মধ্যযুগে এ ক্ষেত্রে স্থবিরতা নেমে আসে। মুসলিম সমাজ এ যুগে অবক্ষয়ের শীর্ষস্তরে পৌঁছে যায়। ছূফীবাদী সাধকগণ হিন্দু সমাজকাঠামো ও আচারের সাথে প্রায় একাত্ম হয়ে যাওয়ায় ইসলামের বিশেষত্ব হারিয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে আল্লাহর স্বরূপ, সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক, আত্মার প্রকৃতি, আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের প্রকৃতি, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, ভক্তিবাদ ইত্যাদি বিষয়ে তারা হিন্দু, জৈন যোগী-সাধকদের ধারণার সাথে ঐকান্তিকতায় উপনীত হন। হিন্দুদের নির্বাণ সম্পর্কিত ধারণা, অষ্টমার্গিক পথ, যোগাভ্যাস, অলৌকিক শক্তির সাথে পরিচয়, মানুষের দেহে ঐশী আবির্ভাব, মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি ইত্যাদি ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয় ফানা, বাকা, তরীকা বা সুলূক, মোরাকাবা, কারামত, হুলূল, তানাসুখ প্রভৃতি নামে। ছূফীদের আচারগুলোও ছিল হিন্দু দর্শনের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রভাবান্বিত।[৩] ইসলামের বিশুদ্ধ একত্ববাদ ছূফীদের কপোলকল্পিত উদ্ভট জটিল ব্যাখ্যায় রহস্যাবৃত্ত হয়ে পড়ে এবং কার্যতঃ তা সর্বেশ্বরবাদী (ওয়াহদাতুল উজূদ) ধারণায় উপনীত হয়।[৪] যার মারাত্মক ফল হল- অগণিত মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যে, মুসলমানরা অমুসলমানদের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ অন্বেষণ করতে পারে। তারা হিন্দুদের বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদসহ জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদের মত বিকৃত মতবাদের মাঝে অভিন্ন ক্ষেত্র খুঁজে পায়। তাই এ সময় দেখা যেত অনেক মুসলিম সাধকের হিন্দু শিষ্য ছিল আবার হিন্দু সাধকের মুসলিম শিষ্য ছিলো। যার অনিবার্য পরিণতি ছিল ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে পার্থক্য ধীরে ধীরে দূরীভূত হওয়া। সত্যপীর, বড় খান গাজী, কালুশাহ, মানিক পীর (শীব) প্রমুখ পীর একই সাথে হিন্দুদের দেবতা ও মুসলমানদের পীর বলে গণ্য হতো। সব ধর্মে সত্য আছে, বহুভাবে আরাধনা করা যায়, আল্লাহ বলে পৃথক কোন স্বত্তা নেই বরং গোটা পৃথিবীর অস্তিত্ববান সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহর প্রকাশ নিহিত, তাই নক্ষত্র, গো বৎস বা যে কোন জিনিসেরই উপাসনা মূলতঃ আল্লাহরই উপাসনা। এজন্য সমুদয় মতের প্রতি সহনশীল থাকা উচিৎ। বহুত্ববাদ সমাজের জন্য সহায়ক। আসল লক্ষ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতি; কোন ধর্ম, মতবাদ বা সমাজের আনুগত্য নয়- ইত্যাদি ধারণা জনসমাজে নিত্য হয়ে পড়ে। কর্ম ফলাফল তথা জান্নাত-জাহান্নামের প্রত্যাশা বা ভীতি ব্যতীত কেবলমাত্র প্রতিপালক প্রভুর প্রতি ভালবাসা-অনুরক্তি প্রদর্শনই ছিলো তাদের সাধনার মূল কথা।

এসব ছূফীদের প্রবর্তিত ও প্রচারিত সোহরাওয়ার্দীয়া, চিশতীয়া, কলন্দরীয়া, মাদারীয়া, সাত্তারীয়া, রুহানীয়া, নকশবন্দীয়া, কাদেরিয়া প্রভৃতি জানা-অজানা শতাধিক তরীকায় বাংলার মাটি ছেয়ে যায়। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'সহ হিন্দুদের রচিত পুঁথি, পদাবলীতে এসবের উল্লেখ রয়েছে। সোহরাওয়ার্দীয়া ও চিশতীয়া তরীকাপন্থীরা অদ্বৈতবাদ [৫] তথা সর্বেশ্বরবাদের প্রচারক ছিল। পাক-ভারত-বাংলার হিন্দুয়ানী মানসক্ষেত্রে এ মতবাদ অনুকূল ছিল বলে এই দুই পন্থীদের মতবাদ এ দেশে সহজেই আসন লাভে সমর্থ হয়। ফলে পীরপূজা[৬], কবরপূজাসহ নানা শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে ডুবে যায় মুসলিম সমাজ। অদৃশ্য অমূর্ত আল্লাহর পরিবর্তে দৃশ্যমান পীর-দরবেশই বাংলার ভক্তিবাদী, গুরুমুখী সাধারণ মানুষের ভক্তি বেশী আকর্ষণ করে। বিপদকালে স্রষ্টার পরিবর্তে পীরের কাছে ধর্ণা দেওয়া, পীরের মাযারে মানত করা, তাবীজ-কবজ নেওয়ার প্রবল ঐতিহ্য এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে উঠে।

অপরদিকে নিজেদের অসচেতনতায় ও আন্তকলহে শাস্ত্রীয় আলেমগণ ইসলামী শিক্ষার সার্বজনীন অভিভাবকত্ব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কুরআন-হাদীছের চর্চা বাদ দিয়ে তারা ফিকহী খুঁটিনাটি বিষয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকতেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কোন অবস্থান ছিল না। এমনকি ইসলামবিরোধী শক্তিসমূহ সম্বন্ধেও তারা তেমন একটা সচেতন ছিলেন না। অপরদিকে ছূফী পীর-ফকিররা সাধারণ জনগণের অনেক নিকটতর হওয়ায় অনেক বেশী প্রভাব রাখতে পারতেন। তাদের অনাড়ম্বরতা, সরলতা সাধারণ মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করত। ফলে তাদের ইসলামী আক্বীদা পরিপন্থী কার্যকলাপের প্রতিরোধ করা ছিল অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। পরিস্থিতি এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় যে এমনকি শাসকরা পর্যন্ত বিষয়টির ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেও প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। এরই মাঝে এই সর্বগ্রাসী পথভ্রষ্টতায় উদ্বিগ্ন কতিপয় বিশুদ্ধতাবাদী আলেমগণ এবং স্বয়ং ছূফীদের কেউ কেউ মুসলমানদেরকে রক্ষার কঠিনতম কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাদের প্রচেষ্টায় ও বিশেষতঃ মুসলিম শাসনের উপস্থিতির কারণে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও এই দুরবস্থার মাঝে মুসলমানরা কমপক্ষে আত্মপরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যবোধ টিকিয়ে রেখে নিজেদের অস্তিত্ব হেফাযত করতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও হিন্দুদের ব্যাপক শত্রুতা যে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার এ সংগ্রামে একটা বড় ভূমিকা রেখেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বাদশাহ আকবরের সময় উপমহাদেশে ইসলামের উপর বয়ে যায় চূড়ান্ত বিপর্যয়ের ঝড়। সভাসদ ও অন্দরমহলের প্ররোচনায় অশিক্ষিত আকবর এমনসব উদ্ভট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা ছিল একেবারেই স্থূল ও অতি নীচ চেতনার পরিচায়ক। তার চেয়েও ন্যক্কারজনক ছিল আকবরের সমর্থনে দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলিম নামধারী ওলী-আওলিয়া, ফকীহ ও আলেমগণের হীন ও ঘৃণ্য আচরণ। এমনকি

৩. যেমন- ছূফী রীতির লতীফা ও রাবিতা (মধ্যস্থ বা গুরুর মাধ্যমে পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়ার পদ্ধতি) ভারতীয় কুণ্ডলীনী ও গুরুবাদেরই প্রতিচিত্র। হিন্দুদের গুরু/ সাধক/ ঋষী-শিষ্য-আশ্রম ও মুসলমানদের সংস্কৃতিতে পীর/ দরবেশ/ ওলী- মুরীদ- খানকাহ/ দরগাহ; হিন্দু রীতির প্রেম, যোগসাধন, দশা ও প্রানায়ামের জপ, কীর্তন ছূফী নীতিতে ইশক, হাল, মাকাম ও যিকর; উপাসনায় বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৪. সর্বেশ্বরবাদ অর্থ সর্বভূতে আল্লাহর অধিষ্ঠান বা 'অহং বক্ষ্মাস্মি'বাদ তথা 'স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; বরং সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার প্রকাশ' মতবাদ। আল্লাহকে ফার্সীতে 'খোদা'- খোদ (স্বয়ং) + আঃ (আসিয়াছেন) - মানে সংস্কৃত ভাষায় যাকে স্বয়ম্ভু বলা হয় তা এই শিরকী আক্বীদা থেকেই উৎসারিত।

৫.'স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন; সৃষ্টি স্রষ্টার সাথে ফানা বা মিশে যেতে পারে' মতবাদ।

৬. ফার্সী শব্দ 'পীর' বলা হতো ইরানের অগ্নি উপাসকদের গুরুকে।

আকবরের প্রবর্তিত হাস্যকর 'দ্বীনে ইলাহী' নামক ধর্মের বায়'আতনামার খসড়ায় স্বাক্ষরদানকারী ১৮ জনের ১৭ জনই ছিল মুসলমান! এ ছিল মুসলমানদের উপর সুদীর্ঘকাল যাবৎ চেপে বসা অশিক্ষা, কুসংস্কারের অবশ্যম্ভবী পরিণতি। মাওলানা আকরম খাঁ বলেন, 'তাতারীদিগের উত্থান ও তাহার ভয়াবহ পরিণতির কথা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু জাতির সহস্ত-সঞ্চিত যে মহাপাতকের প্রতিক্রিয়া চঙ্গেজ ও হালাকু খাঁ রূপে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রতি লক্ষ্য করার মত চিন্তাশীল মানুষ মুছলমান সমাজে আজও খুব কমই দেখা যায়'। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, যথাসময়ে মুজাদ্দিদ আলফে ছানীর দুঃসাহসিক আবির্ভাব না ঘটলে হিন্দুস্থানের বুক থেকে তিনশত বছর পূর্বেই ইসলামের নাম-গন্ধ পর্যন্ত উঠে যেত। বাদশাহ আকবারের অনাচারের বিরুদ্ধে শায়খ আহমাদ সারহিন্দীর পরিচালিত (১৫৬৩-১৬৩৪ খৃঃ) এই সংস্কারবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে এই প্রথম জাগ্রত হয় এক নতুন চেতনা। মধ্যযুগের নির্জীবতায় সৃষ্টি হয় নবচাঞ্চল্য। পরে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সংস্কারধর্মী পদক্ষেপে ইসলামী শাসনধারার সাথে কিছুটা হলেও পরিচিত হতে সক্ষম হয় মুসলিম সমাজ।

উপমহাদেশে শী'আদের প্রভাব শুরু হয় সম্রাট বাবরের মাধ্যমে। রাজ্যশাসনে একজন যোগ্য মিত্র শী'আ মতাবলম্বী শাহ ইসমাইল সাফাভীর সান্নিধ্যে এসে শী'আ মতবাদ সম্পর্কে তার বিরোধী মানসিকতা লোপ পায়। পরবর্তীতে বাবরের পুত্র হুমায়ুন ইরানে নির্বাসিত জীবন-যাপনকালে ইরানী অভিজাতদের সংস্পর্শে এসে প্রভাবান্বিত হন। রাজ্য ফিরে পাওয়ার পর তিনি তুর্কী কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য প্রতিরোধে তার শী'আ বন্ধুদের মুঘল দরবারে হিজরতের আমন্ত্রণ জানান। তখন থেকেই প্রতিভাবান ইরানীরা সাম্রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে পড়ে। শী'আ সম্প্রদায়ভুক্ত বিখ্যাত বৈরাম খাঁ হুমায়ুনের ডানহাতে পরিণত হন যিনি পরে সম্রাট আকবরের অভিভাবকত্বের দায়িত্বেও নিয়োজিত হন। এভাবে শী'আ মতবাদ উপমহাদেশে শক্তভাবে স্থান করে নেয় যার প্রভাব বাংলাতে পড়ে। শী'আ সাহিত্যিকদের মাধ্যমে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা, মুহাররম পর্ব ও অন্যান্য শী'আ আচার-অনুষ্ঠান এ অঞ্চলের মানুষের চেতনারাজ্যে গভীরভাবে স্থান করে নেয়।

এছাড়া ভিন্নধারার একটি অবক্ষয় বিশুদ্ধতাবাদী আলেমদের মাঝেও মধ্যযুগে সবসময়ই বিরাজ করেছিল। আব্বাসীয় খিলাফতের কিছুকাল পূর্বে মাযহাব বা ধর্মীয় ব্যাখ্যা নিয়ে আলেমদের মধ্যে দলগত যে বিভক্তি বিরাট আকারে মাথাচাড়া দেয় খিলাফতের পতন পরবর্তী চিন্তার অস্বাভাবিক স্থবিরতার সময় তা মুসলিম বিশ্বে স্থায়ী ভিত্তি লাভ করে। এদেশে আগত ছূফী-সাধকগণ এবং তুর্কী ও আফগান শাসকগোষ্ঠী হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়ায় এ অঞ্চলের অধিবাসীরাও এই মতবাদের অনুসারীতে পরিণত হয়। আলেমদের এক বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল এই মাযহাবগত বিরোধ। এ বিরোধ এড়ানো তাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যায়ে একমাত্র শাহ ওয়ালীউল্লাহই ছিলেন এ ক্ষেত্রে প্রায় সফল এক ব্যক্তিত্ব, যিনি স্বয়ং এ বিরোধ দূরীকরণে অসাধারণ ভূমিকা রাখেন। ইসলামের বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র ধারার যে স্বর্ণোজ্জ্বল দ্বীপশিখা তিনি উপমহাদেশের বুকে প্রজ্জ্বলন করেছিলেন তা আজও পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য প্রকৃত ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে।

এ সময় বাংলায় হাদীছের চর্চা তেমন উল্লেখযোগ্য আকারে ছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে চতুর্দশ শতকে দিল্লির খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ নিযামুদ্দীন আওলিয়ার ছাত্র শায়খ সিরাজুদ্দীন গৌড়ে ইসলাম প্রচার করেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে আলাউদ্দীন আলাউল হক, নুর কৎবে আলম, জৌনপুরের ইবরাহীম শারকী, রাজশাহীর শাহ মু'আয্যম দানিশমন্দ, ঢাকার মুহাম্মাদ দায়েম প্রমুখের নাম জানা যায় যারা ইলমে হাদীছের চর্চা এ অঞ্চলে জারী রেখেছিলেন। বাংলার সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯ খৃঃ) ছিলেন ইলমে হাদীছের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং অবক্ষয় যুগে অল্পবিস্তর হলেও বাংলায় রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী বিশুদ্ধ ইসলামী জীবনধারা পরিচালনার ধারা যে অব্যাহত ছিল এটা নিশ্চিত। প্রাচীন পুঁথি সাহিত্যেও মাঝে মাঝে এর নিদর্শন পাওয়া যায়।[৭]

আলোচনার প্রান্তে এসে বলা যায় যে, বাংলার মুসলিম সমাজে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিভিন্নরূপে জাহেলিয়াতের আক্রমণ ঘটেছিল মূলতঃ ৩টি কারণে- (১) মুসলমানদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ, (২) ছূফীবাদের গঠন-প্রকৃতি ও তাদের মাধ্যমে আগত ইসলাম; যা ছিল মূলতঃ ইসলামের ইরানী সংস্করণ ও (৩) তুর্কী ও মোগল শাসকদের কার্যকলাপ। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ প্রেরিত এবং রাসূল (ছাঃ) প্রচারিত বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সামাজিক নীতিমালা এ অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয়নি। শাসকদের মাঝেও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইসলামী আদলে গড়ে তোলার ছিল না কোন হৃদ্যিক তাকীদ। ফলে নামে-বেনামে বহু বিজাতীয় কুসংস্কার, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান মুসলিম সমাজের মন-মস্তিষ্কের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। তাওহীদ ও রিসালতের স্বচ্ছ সলিলে জমে যায় শিরক ও বিদ'আতের বিষাক্ত কালো আবর্জনার স্তূপ। ইসলাম বাংলার মানুষের মাঝে প্রচলিত অর্থের একটি আধ্যাত্মবাদী ধর্ম হিসাবেই চর্চিত হতে থাকে। মূর্তিপূজা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সংশয় না থাকলেও অন্যান্য শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ডের সাথে আপস করার মনোবৃত্তি মুসলিম সমাজে যুগ যুগ ধরে পরিপুষ্ট হয়। এ সমস্ত কারণে মূল্যবোধের নিরিখে চারিত্রিকভাবে কিছুটা সুদৃঢ় থাকলেও আক্বীদা-বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অধঃপতনের অতল তলে ডুবে ছিল বাংলার মুসলিম সমাজ।

তথ্যসূত্র :

মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস- মাওলানা আকরম খাঁ।

বাংলাদেশে ইসলাম- আব্দুল মান্নান তালিব।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা- কে.এম. রইসউদ্দীন খান।

ফিনিসিয়া থেকে ফিলিপাইন- মোহাম্মাদ কাসেম।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৮৪)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন- ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

ভারতবর্ষের ইতিহাস- ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান।

ইতিহাসের ইতিহাস- গোলাম আহমদ মর্তুজা।

উপমহাদেশের রাজনীতিতে আলেম সমাজ- আই. এইচ. কোরেশী।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব- ড. তারা চাঁদ।

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস- ড. আব্দুল করীম।

বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য- ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী।

৭. যেমন- মধ্যযুগে নাগরীলিপিতে লিখিত মুন্সী সাদেক আলী রচিত পুথিসাহিত্য 'কেতাব হালতুন্নবী' (শামায়েলে মুহাম্মাদী অথবা নবীজীবনী) যা একসময় সিলেটের ঘরে ঘরে পাঠ করা হতো তার শেষের দিকে লেখক বলছেন, 'আখেরী যামানায় এই বাংলায় নবীর সুন্নাত যারা মানবে তারা একেকজন শহীদের ছওয়াব পাবে'। শেষ অধ্যয়টির নাম 'বেদাতীর বয়ান' (ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০০৯) পৃষ্ঠা ২৫৮।

বিশ্বে প্রচলিত ধর্মসমূহ

হোসাইন আল-মাহমূদ

ধর্মকে যদি বলা হয় অদৃশ্য উচ্চতম একটি শক্তির শর্তহীন নিরঙ্কুশ আনুগত্যের নাম (feeling of absolute dependence) কিংবা উচ্চতম শক্তির সাথে নিম্নের অধিবাসীদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, তাহলে বিভিন্ন মতবাদ, ইজম, দর্শন ইত্যাদিকে বাদ রেখেই কেবল ধর্ম হিসাবে পরিগণিত ধর্মের সংখ্যাই অগণিত। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রচলিত ধর্মগুলোর সংখ্যা আনুমানিক ৪২০০ বলা হয়। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৮৫ ভাগেরও বেশী মানুষ কোন না কোন ধর্মের অনুসারী। নিম্নে এসব ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের উপর একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপিত হলো।

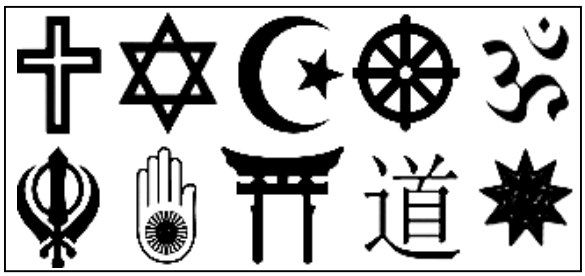

২০০৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে ৪টি বৃহৎ ধর্মের অনুসারী সংখ্যা ৭৫%-এরও বেশী এবং প্রাচীন ধর্মের অনুসারী ৪%। ১২% অর্থাৎ ৭৭৫ মিলিয়ন মানুষ বিশেষ কোন ধর্মের অনুসরণ করে না অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ, মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী, সংশয়বাদী অথবা মানবতাবাদীগণ। নাস্তিক বা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় এমন লোকের সংখ্যা ২% বা ১৫০ মিলিয়ন।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বর্তমান বিশ্বে উল্লেখযোগ্য ধর্ম ১৯টি যাদের ২৭০টি ভিন্ন ভিন্ন ও বৃহৎ গ্রুপ রয়েছে। বৃহৎ কয়েকটি ভাগ ছাড়াও খৃষ্টানদের মধ্যে ৩৪,০০০ ধর্মীয় গ্রুপ দৃশ্যমান যাদের অর্ধেকেরই পৃথক চার্চ রয়েছে যেখানে অন্যদের প্রবেশাধিকার সীমিত। আমেরিকা ও কানাডাতে প্রায় ১০০০ খৃষ্টান গ্রুপ রয়েছে যাদের ধারণা তারাই যথার্থ খৃষ্টান।

ধর্মসমূহকে আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. **ইবরাহীমী ধর্ম:** যেমন- ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম।

২. **ইন্ডিয়ান ধর্ম:** যেমন- হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, কাদীয়ানী।

৩. **পূর্ব এশিয়ান ধর্ম:** যেমন- কনফুসিয়ান ও তাওই।

৪. **আফ্রিকান বিচ্ছিন্ন ধর্ম:** আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে প্রচলিত মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকান ধর্ম যা ১৬-১৮ শতকে দাস ব্যবসার সময় আমেরিকায় আনীত হয়।

৫. গোত্রীয় ধর্ম: প্রাচীন পৌত্তলিক বা লোকায়ত ধর্মসমূহ যেমন: এশিয়ার সামানী ধর্ম, আমেরিকার আঞ্চলিক ধর্ম, অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ধর্ম, চীনের লোকায়ত ধর্ম, শিন্টো ইত্যাদি।

৬. ইরানী ধর্ম: জরথুস্থ, ইয়াজদা, আহলে হক্ব, বাহাই ইত্যাদি।

নিম্নে একনজরে এসব ধর্ম সম্পর্কে একটি বিবরণ দেওয়া হলো-

প্রকরণ	ধর্মের নাম	অনুসারীর সংখ্যা	উৎপত্তিকাল	প্রধান অবস্থানসমূহ	পবিত্র গ্রন্থ	উপাসনালয়	ধর্মনেতার পদবী
ইবরা-হীমী ধর্ম	খৃষ্টান	১.৯- ২.১ বিলিয়ন	১ম খৃষ্টাব্দ	উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ এবং মধ্য,পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশ বাদ দিয়ে সমস্ত বিশ্ব	বাইবেল *পবিত্র শহর-* জেরুজালেম	চার্চ, ক্যাথেড্রাল, টেম্পল, মিশন	পাদ্রী, প্রিয়েস্ট, মিনিস্টার, বিশপ
	ইসলাম	১.৫ বিলিয়ন	৭ম খৃষ্টাব্দ	মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, মালয় দ্বীপপুঞ্জ। এছাড়া বলকান উপদ্বীপ, রাশিয়া, চীন ও ইউরোপে প্রচুর সংখ্যক রয়েছে।	কুরআন *পবিত্র শহর-* মক্কা ও মদীনা	মসজিদ	ইমাম
	ইহুদী	১৪.৫ মিলিয়ন	খৃষ্টপূর্ব ১৩০০	ইসরাঈল এবং উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ	সিনাগগ *পবিত্র শহর-* জেরুজালেম	তাওরাত, তানাক ও তালমুদ	রাব্বী
	রাস্তাফারী আন্দোলন	৭০০,০০০	১৯৩০	জামাইকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আফ্রিকা	-	-	-
ইন্ডিয়ান ধর্ম	হিন্দু	৮২৮ মিলিয়ন	আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৫০০	ভারত উপমহাদেশ, ফিজি, গায়ানা ও মৌরিশাস	মন্দির ও অন্যান্য *পবিত্র শহর-* বেনারস	ভগবতগীতা . উপনিষদ, ঋগবেদ ও মনুস্মৃতি	পুরোহিত
	বৌদ্ধ	৩৬৪ মিলিয়ন	খৃষ্টপূর্ব ৫২৩	ভারত উপমহাদেশ,পূর্ব এশিয়া, ইন্দোচীন ও রাশিয়ার কিছু অঞ্চল	প্যাগোডা, স্টুপা, মন্দির	ত্রিপিটক ও সূত্রসমূহ	মঙ্ক
	শিখ	২৩.৮ মিলিয়ন	১৫শ খৃষ্টাব্দ	ভারত উপমহাদেশ,দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম	গুরুদুয়ারা	গুরু গ্রন্থ সাহেব	গ্রন্থী (পেশাদার

				ইউরোপ			পাঠক)
	জৈন	৪.৩ মিলিয়ন	খৃষ্টপূর্ব ৮০০	ইন্ডিয়া ও পূর্ব-আফ্রিকা	মন্দির	সিদ্ধান্ত, প্রকৃত	পুরোহিত, পণ্ডিত
দূর প্রাচ্যের ধর্ম	তাওই	২.৭ মিলিয়ন	খৃষ্টপূর্ব ৫৫০	চীন	-	-	-
	কনফুসিয়ান	৬.৩ মিলিয়ন	খৃষ্টপূর্ব ৫২০	চীন, কোরিয়া ও ভিয়েতনাম	সেওন, মন্দির	লুন-উ	-
প্রাচীন ও গোত্রীয় ধর্ম	চীনা লোকায়ত ধর্ম	৩৯০ মিলিয়ন	আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ২৭০	চীন	-	-	-
	শিন্টো	২.৭ মিলিয়ন	৫০০ খৃষ্টাব্দ	জাপান			
	আফ্রিকান আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্ন ধর্ম	১০০ মিলিয়ন	অজ্ঞাত	আফ্রিকা ও আমেরিকা			
	প্রাচীন পৌত্তলিক ও সর্বপ্রাণবাদী ধর্ম	২৩২ মিলিয়ন	প্রাক-ঐতিহাসিক	ইন্ডিয়া ও এশিয়া			
অন্যান্য	চন্দোগো	৩ মিলিয়ন	১৮১২	কোরিয়া			
	তেনরিকো	২ মিলিয়ন	১৮৩২	জাপান ও ব্রাজিল			
	কাওডাই	২ মিলিয়ন	১৯২৫	ভিয়েতনাম			
	আহলে হক্ব	১ মিলিয়ন	১৪০০ খৃষ্টাব্দ	ইরাক , ইরান			
	সেইচো নো-লে	৮০০,০০০	১৯২৯	জাপান			
	ইয়াজদা	৭০০,০০০	১২০০ খৃষ্টাব্দ বা তারও পূর্বে	প্রধানতঃ ইরাক	-	-	-
	জরথ্রুস্থ	২.৬ মিলিয়ন	৬ষ্ট খৃষ্টাব্দ	ইরান ও ইন্ডিয়া	আতশ বেহরাম, এ্যাগিয়ারী, উপসনালয়	এভেস্টা	মবেদ, দস্তুর
	বাহাই	৭.৪/৬.৫ মিলিয়ন	১৮৬৩	ইরানসহ বিশ্বের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে	উপাসনালয়	আল-কিতাবুল আকদাস	-
	কাদীয়ানী		১৯শ খৃষ্টাব্দ	ইন্ডিয়া	-	-	-
	ধর্মহীন/ নাস্তিক	৯২৫ মিলিয়ন	-	পৃথিবীর সবদেশেই কমবেশী রয়েছে। ইরান ও সৌদি আরবে নাস্তিকতা আইনতঃ নিষিদ্ধ	-	-	-
	সার্বজনীন তাবাদী	৬৩০,০০	১৯৬১	আমেরিকা, ইউরোপ	-	-	-
	শী'আ *(আটটি বৃহৎ স্বতন্ত্র গ্রুপ এর অন্তর্ভুক্ত)*	১৪৫ মিলিয়ন	৬৬১ খৃষ্টাব্দ	ইরান, ইরাক, বাহরাইন. ইয়েমেন, লেবানন	-	-	-

প্রধান ধর্মসমূহ

ধর্ম	অনুসারী	জনসংখ্যার শতকরা অংশ
বিশ্বের সর্বমোট জনসংখ্যা	৬,৬৭১ মিলিয়ন	-
খৃষ্টান	১,৬২৩- ১,৯২৩ মিলিয়ন	২৪.৫৪%- ২৮.৮২% (ক্রমহ্রাসমান)
ইসলাম	১,৫২৫- ১,৫৫৯ মিলিয়ন (৭-১১% বা ১৪৫ মিলিয়ন শি'আ এ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত)	২২.৭৫%- ২৩.৩১% (ক্রমবর্ধিষ্ণু)
বৌদ্ধ	৪৮৯ মিলিয়ন- ১,৫১২ মিলিয়ন	৭.৩৩%- ২২.৬৭% (স্থির রয়েছে)
হিন্দু	৯৬৫- ৯৭১ মিলিয়ন	১৪.৪৭%- ১৪.৫৫% (স্থির রয়েছে)
সর্বমোট	৪,৫৪১-৫,৯২০ মিলিয়ন	৬৮.০৮%- ৮৮.৭৪%

সূত্রঃ উইকিপিডিয়া, Ontario Consultants on Religious Tolerance।

একজন কম্যুনিস্টের মহৎ নিরীক্ষণ

আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

গ্রন্থকার পরিচিতিঃ ইন্ডিয়ার চব্বিশ পরগণায় জন্মগ্রহণকারী খ্যাতনামা বঙ্গদেশীয় তাত্ত্বিক ও সংগঠক মানবেন্দ্র নাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪)। যিনি এম.এন.রায় নামেই অধিক খ্যাত। র‍্যাডিক্যাল হিউমানিস্ট আন্দোলনের পুরোধা এই ব্যক্তি লেলিন, স্টালিন, ট্রটস্কি, বুখারিনের সাথে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। মেক্সিকো ও ইন্ডিয়াতে তিনিই প্রথম কম্যুনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিশ্ব-বিপ্লবের লক্ষ্যে বহু দেশ তিনি এ সময় সফর করেন। বিশ্বখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ, আইনস্টাইনদের মত বিজ্ঞানীদের সাথে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে তিনি নেহেরু, সুভাষ বোসদের সাথে ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে পারঙ্গম ও মানব সভ্যতার প্রতি মমতাময় দূরদৃষ্টির অধিকারী এম. এন. রায় ছিলেন একাধারে রাজনীতিবীদ, লেখক ও বৈজ্ঞানিক। কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও তিনি ১৬টিরও বেশী বই লিখেছেন। অক্সফোর্ড থেকে তার সমুদয় রচনাবলী ৪ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৬-৩৭ সালের দিকে তিনি কম্যুনিজম পরিত্যাগ করেন এবং সাম্যবাদী অর্থনৈতিক বিপ্লবের পরিবর্তে দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনে সচেষ্ট হন। যদিও তিনি কম্যুনিজমের মৌলিক চিন্তাধারা থেকে সরে আসেননি। ১৯৫২ সালে তিনি আমষ্টারডামে গঠিত বিশ্ব মানবতাবাদী আন্দোলনের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁর মানবতাবাদ ছিল কেবলই মানুষের মৌলিক চাহিদা ও তার পারিপার্শিক অবস্থা বিশ্লেষণের উপর ভিত্তিশীল। এ মতবাদে ইন্ডিয়ার প্রচলিত রাজনীতি ও দার্শনিক ধারা পুরোপুরি না হলেও অধিকাংশই বর্জন করা হয়েছে বলে একে র‍্যাডিক্যাল আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি নৈতিকতাকে একমাত্র জীবজগতের মাঝেই অনুসন্ধান করেছেন এবং মানবতার উন্নতি একমাত্র স্বাধীনতা ও সত্যের উপর নির্ভরশীল বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

১৯৩০ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করে। দীর্ঘ ৬ বছরের কারাজীবনে তিনি কয়েকটি বই লিখেন। এই সুযোগে ইসলামের উপর তাঁর পড়াশোনার সুযোগ হয় এবং The Historical role of Islam (ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান) নামের অসাধারণ পুস্তিকাটি লেখেন। বইটি ১৯৪৮ সালে বাংলায় অনূদিত হয়।

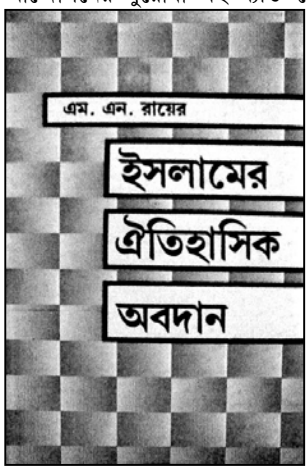

মূল লেখকঃ এম.এন. রায়
অনুবাদকঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই
প্রকাশকঃ এ.কে. মল্লিক
কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

গ্রন্থ পর্যালোচনাঃ

৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকায় লেখক একজন কম্যুনিস্ট হিসাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামের মৌলিকতার দিকে গভীর দার্শনিকতা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি চেয়েছেন মানবসমাজকে ইসলাম সম্পর্কে জিইয়ে রাখা ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করে একটি ইতিবাচক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিতে, বিশেষতঃ ইন্ডিয়াবাসীকে যারা মুসলমানদেরকে বহিরাগত মনে করে অন্তরের দিক থেকে দূরত্ব অনুভব করে। হিন্দুদের এই ভ্রান্ত ধারণার কথা ভূমিকা অধ্যায়েই উল্লেখ করেছেন, 'পৃথিবীর কোন সভ্য জাতিই ভারতীয় হিন্দুদের মত ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে এমন অজ্ঞ নয় এবং ইসলাম সম্পর্কে এমন ঘৃণার ভাবও পোষণ করে না।'

তিনি শুরু করেছেন সমরকন্দ থেকে স্পেন পর্যন্ত বিশাল ভূখন্ডে অনধিক একশত বছরের মধ্যে সংঘটিত ইসলামের অভূতপূর্ব সামরিক ও সাংস্কৃতিক বিজয়কে অলৌকিকত্বের ভূষণ পরিয়ে। নতুন বিশ্বাসে ঐকান্তিক আগ্রহ সম্বলিত আরব মরুভূমির অপেক্ষাকৃত ছোট, একটা বেদুঈন দলের কাছে প্রাচীনকালের বৃহৎ সাম্রাজ্য অবিশ্বাস্য দ্রুগতিতে কিভাবে ধর্মান্তর গ্রহণ ও পরাজয় বরণ করল, লেখকের কাছে তা অবোধগম্য ঠেকেছে। একে stupendous miracle (বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা) আখ্যা দিয়ে এর উত্তর তিনি নিজেই খুঁজেছেন- 'ঘুণে ধরা প্রাচীন সভ্যতাগুলো মানবসমাজকে যে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছিল ইসলামের বৈপ্লবিক আহবান তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। এটাই ছিল এই নিরংকুশ সাফল্যের প্রাথমিক কারণ।'[১]

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ইসলাম যদি শুধু আরবীয় মুসলমানদের অপূর্ব সামরিক শক্তির দিগ্বিজয়ী ভূমিকার অভিনয়ই করে থাকে, তাহলে ইতিহাসে তার তেমন অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য রইলো কোথায়? তাতার এবং সিথিয়ার অসভ্যদের ধ্বংসলীলার বিপরীতে মুসলমানরা মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যে এক অনন্যসাধারণ ধারা সৃষ্টি করেছে তা এক অতুলনীয় অবদান। আরবদের তলোয়ার কেবল এটাই প্রমাণ করেছে যে, তা মানবতার অগ্রগতিকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর করতে সমর্থ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৃথিবীর বুকে ইসলামের মিশন কি ছিল তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী সমালোচকরা যারা মনে করে ইসলামের উত্থান শান্ত ও সহিষ্ণু লোকদের উপর গোড়ামির বিজয়, ইসলামের ইতিহাস সামরিক দুর্ধর্ষতার ইতিহাস, তাদের মূর্খতার প্রতি কঠোর বিদ্রুপবান হেনে তিনি জবাব দিয়েছেন, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ইসলাম যদি শুধু আরবীয় মুসলমানদের অপূর্ব সামরিক শক্তির দিগ্বিজয়ী ভূমিকার অভিনয়ই করে থাকে, তাহলে ইতিহাসে তার তেমন অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য রইল কোথায়? তাতার এবং সিথিয়ার অসভ্যদের ধ্বংসলীলার বিপরীতে মুসলমানরা মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যে এক অনন্যসাধারণ ধারা সৃষ্টি করেছে তা এক অতুলনীয় অবদান। আরবদের তলোয়ার কেবল এটাই প্রমাণ করেছে যে, তা মানবতার অগ্রগতিকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর করতে সমর্থ।

তিনি ইসলাম সম্পর্কে মূল্যায়নে মানুষের অদূরদর্শিতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, জনসাধারণের চিন্তাধারা ইসলামের বিস্ময়কর সামরিক

1. The phenomenal success of Islam was primarily due to its revolutionary significance and its ability to lead the masses out of the hopeless situation created by the decay of antique civilizations not only of Greece and Rome but of Persia and China-and of India.

সফলতার উপর এসেই আটকে যায়। তারা ভুলে যায় সেই মহান বিপ্লব-প্রসূত বৃহত্তর সম্পদের কথা; তা মুসলমানই হোক আর অমুসলিমই হোক। মূলতঃ মুহাম্মাদের একেশ্বরবাদ আরবীয় মুসলমানদের তলোয়ার সঞ্চালনে এমন অজেয় ক্ষমতা দান করেছিল যে, তা শুধু আরব উপজাতির দুষিত পৌত্তলিকতাকেই নষ্ট করল না বরং ধর্ম সমূহের ভ্রষ্টতা, অন্ধবিশ্বাস আর সন্ন্যাসী-সংক্রমিত ব্যাধির হাত থেকে অগণিত মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য এক ঐতিহাসিক প্রতিরোধ শক্তি (Invincible instrument of history) হয়ে উঠল। খুব গভীর দৃষ্টিতে প্রসঙ্গের সমাপ্তি টেনেছেন তিনি- 'প্রকৃতঅর্থে আল্লাহর নামে সঞ্চালিত ইসলামের এই তলোয়ার এমনই একটি নতুন সামাজিক শক্তি, এক নতুন বিদগ্ধ জীবনের উদ্ভব ঘটাল যা অন্য সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের সমাধি রচনা করেছিল।' [২]

সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিকতা এবং এর সত্যাশ্রয়ী প্রভাব বিস্তারের অতুলনীয় ক্ষমতাকে লেখক বিশেষভাবে তুলে এনেছেন। দ্বিধাহীনচিত্তে দেখিয়েছেন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আল-কুরআনের সহজ-সরল, বিবেকীয় ও কুসংস্কারমুক্ত, মানুষে মানুষে সমতাসূচক দূরদর্শী নীতিমালার বৈপ্লবিকতা। যার মাঝে তিনি সমাজ বিপ্লবের চিরনতুন এক ধারার সন্ধান পেয়েছেন। তার মতে, এ ধারারই চূড়ান্ত পরিণতি হল আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতা ও বুর্জোয়াবিপ্লব।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে যেয়ে তিনি ব্যাপকভাবে তাঁর মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ফলে মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত থাকলেও ভূল ও স্ববিরোধিতাপূর্ণ বিশ্লেষণে সত্য ধামাচাপা পড়ে গেছে।

এ অধ্যায়ে একদিকে লেখক ইসলামের অবির্ভাবকে অর্থনৈতিক বাস্তবতার ফলশ্রুতি উল্লেখ করে বলেছেন যে, 'অর্থনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি থেকেই মক্কাকে প্রাণকেন্দ্র করে হাশেম পরিবারের একজন মুহাম্মাদ এ নতুন ধর্মমত প্রচার করতে শুরু করেন। এ বুদ্ধিই এ ধর্মকে জাতীয় জীবনে দাড় করিয়ে দিয়েছিল'।- আবার সামান্য পরেই স্ববিরোধিতার নজীর রেখে লিখেছেন, 'প্রথমে কুরাইশরা কাবা মন্দিরের মূর্তি সরাতে বাধা দিয়েছিল এই ভাবনাতে যে তাতে তাদের ব্যবসায় প্রভূত ক্ষতি হবে'। এছাড়া ইসলামের সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়াটা তৎকালীন ভৌগলিক ও সামাজিক অনুকূল পরিবেশের প্রতিফল বলে তাঁর কাছে মনে হয়েছে। তাঁর মতে, আরববাসীর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার কারণ ছিল তৎকালীন প্রচলিত ধর্মীয় ভক্তিহীন যাগ-যজ্ঞ, ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-পয়গাম্বরদের ভিড়, পুরোহিতের নিপীড়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো।[৩] এছাড়া বিভিন্ন সময় রাজাদের নিপীড়নের শিকার হয়ে আরব ভুখণ্ডে আতিথেয়তা গ্রহণ করা গ্রীক দর্শন, খৃষ্টীয় আদর্শবাদের ধারকদের জ্ঞানবত্তাই নাকি পরবর্তীতে আরব বেদুঈনদের হস্তগত হয়ে শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছিল। আর এই উত্তরাধিকারকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে তা জনগণের মাঝে প্রচার করা এবং সকলকে এর আওতাধীনে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা জোগানোর মাঝেই তিনি কুরাইশ বংশের এই স্বার্থক পুরুষ মুহাম্মাদের অবিসংবাদিত কৃতিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।

মোটকথা প্রাচ্যবিদদের মত তাঁরও মনে হয়েছে সামগ্রিক অনূকুল পরিবেশ এবং মুহাম্মাদের মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির আবির্ভাবে এ নতুন ধর্ম, এ নতুন আদর্শের বিজয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। অথচ একই স্থানে নিজ ধারার বাইরে যেয়ে বলেছেন, 'আল্লাহর একত্ববাদ' এ শক্তিধর মহাদর্শনই ইসলামকে অনন্য বৈশিষ্ট্যে অভিষিক্ত করেছিল।[৪] সাথে সাথে ইসলাম যে প্রকৃতঅর্থে প্রচলিত ধর্ম থেকে ভিন্ন কিছু; এটাকে বরং রাজনৈতিক আন্দোলন বলাই যে অধিক সমীচীন তা তিনি খুব জোরের সাথেই উচ্চারণ করেছেন। এভাবে এ অধ্যায়ে তাঁর বক্তব্য প্রায়ই স্ববিরোধীতাপূর্ণ হয়েছে।

একত্ববাদই মুসলমানদের যেমন বলিষ্ঠ চেতনা দিয়েছে তেমনি সহিষ্ণু হতে শিখিয়েছে। শিখিয়েছে এক আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সমতার দৃষ্টি দেওয়া। এ কারণেই মহাসত্যের দিকে আহবান করাকে তারা সার্বজনীন কর্তব্য মনে করে। যতদিন মানুষ স্বেচ্ছায় মুক্তির পথ বেছে না নেয় ততদিন ভবিষ্যৎদৃষ্টিতে তাদেরকে সহজভাবেই ছেড়ে দেয়। সহনশীলতা, সাম্য-মৈত্রীর এই মাহাত্মই তৎকালীন দ্বন্দ্বমূখর সমাজ, শাসকদের নিপীড়নে নিষ্পিষ্ট বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামের সফলতার মূল কারণ নির্ধারণ করতে যেয়ে নির্বাচন করেছেন আল্লাহর একত্ববাদকে। তিনি বলেন, এই একত্ববাদই মুসলমানদের যেমন বলিষ্ঠ চেতনা দিয়েছে তেমনি সহিষ্ণু হতে শিখিয়েছে। শিখিয়েছে এক আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সমতার দৃষ্টি দেওয়া। এ কারণেই মহাসত্যের দিকে আহবান করাকে তারা সার্বজনীন কর্তব্য মনে করে। যতদিন মানুষ স্বেচ্ছায় মুক্তির পথ বেছে না নেয় ততদিন ভবিষ্যৎদৃষ্টিতে তাদেরকে সহজভাবেই ছেড়ে দেয়। সহনশীলতা, সাম্য-মৈত্রীর এই মাহাত্মই তৎকালীন দ্বন্দ্বমূখর সমাজ, শাসকদের নিপীড়নে নিষ্পিষ্ট বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তা না হলে কোন রকমের বলপ্রয়োগে অন্ততঃ টাইগ্রীস থেকে অক্সাস পর্যন্ত বিশাল ভূখন্ডের অধিকারী পারসীরা অভাবনীয় দ্রুততায় এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে পারত না। ইসলামের এই বিস্ময়কর সাফল্যের হেতু তাই যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক, তেমনি আধ্যাত্মিক।[৫]

পঞ্চম অধ্যায়ে মুহাম্মাদের শিক্ষা কি ছিল তা নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে তিনি আবারও প্রাচ্যবিদদের ধারণারই প্রতিধ্বনি করেছেন তবে ইতিবাচক ভঙ্গিতে। প্রশ্রয়ের সুরে তিনি লেখেন, 'ইসলামের প্রবর্তক মুহাম্মাদ অলৌকিকতার দাবী করেছিলেন- এটা তার ভণ্ডামী ছিল না; বরং তৎকালীন পরিবেশ, যুদ্ধরত আর গোত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার

2. The sword of Islam, wielded ostensibly at the service of God, actually contributed to the victory of a new social force-the blossoming of a new intellectual life-which eventually dug the grave of all religions and faiths.

3. The stringent cry of the new religion.-"There is but One God"-softened by great toleration, subject to this fundamental creed, was enthusiastically hailed by the distressed multitudes searching for the secure anchor of a simple faith in the stormy sea of social disintegration, intellectual bankruptcy and spiritual chaos.

4. Oneness of God prepared the ground for the rise of a military State which unified all the social functions-religious, civil, judicial and administrative. The Unitarianism of the Saracens laid the foundation of a new social order which rose magnificently out of the ruins of the antique civi1isation.

5. The cause of the dramatic success of Islam was spiritual as well as social and political.

জন্য তাকে এ জাতীয় কিছু করতে হয়েছে'। তাঁর মতে, অহী অবতরণের ঘটনা একটি 'মানসিক ক্রিয়া'। অবশ্য যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বিষয়টি বুঝতে গিয়ে তার যে সন্দেহ রয়ে গিয়েছিল তা বুঝা যায় পরবর্তী কথায়- 'আগে-পরের 'বিশেষ ক্ষমতা'র দাবীদারদের মত তিনিও কিছু দাবী করলেন। তবে তাঁর বেলায় 'এমন কিছু' (there was a fact) ঘটল যা তার জন্য বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়'। প্রসঙ্গের শেষপ্রান্তে তিনি বলেই ফেলেছেন যে, ইসলামই ধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ; অন্য ধর্মগুলো ধর্মের নামান্তর মাত্র।[৬] এর কারণ হিসাবে তিনি আবারো একেশ্বরবাদের মাহাত্ম তুলে ধরেছেন এবং নিজস্ব চিন্তাধারা তথা মার্ক্সবাদের আলোকে তার ব্যাখ্যা করেছেন।

পরের অধ্যায়ে তিনি ইসলামী দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন মুসলিম দার্শনিকের অবদান উল্লেখ করেছেন। মুসলিম দার্শনিকরা গ্রীক দর্শনের সাথে ইসলামী দর্শনের যে মেলবন্ধনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন লেখক তাতে বরং ইসলামের উদারতা ও পরমতসুহিষ্ণুতার দিকটাই বড় করে দেখেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন মুসলিম বিজ্ঞানীদের বস্তুজাগতিক আবিষ্কারের কথা। ইসলাম কখনই বিজ্ঞানীদের উন্মুক্ত গবেষণায় বাধা দেয় না এটাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এভাবে বিভিন্নদিক থেকে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। যে শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর মতে, দুনিয়ার সকল ধর্মের ভিত্তিমূল ধ্বংস করে দিয়েছে।[৭]

শেষ অধ্যায়ে লেখক হিন্দু অধ্যুষিত বিশাল ভারত উপমহাদেশে একত্ববাদী ধর্ম ইসলামের স্থান করে নেওয়ার কারণ ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। এদেশে ইসলামের প্রসার এ ধর্মের দার্শনিক শ্রেষ্ঠতার চেয়ে সামাজিক কর্মতৎপরতারই ফসল ছিল বলে তিনি মনে করেন। তার মতে, কুরআনের বিধি-বিধান এ দেশের মানুষের মাঝে ইনসাফের শ্যামল বাতাস বইয়ে দিয়েছিল। উদ্ভট আচার-যজ্ঞ, জীবনের প্রতি প্রতিক্রিয়াপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি, বর্ণবাদে নিষ্পিষ্ট মানুষ ইসলামকে মুক্তির দূত মনে করেছিল। ইসলামের সমাজ-বৈপ্লবিক চরিত্র, এমনকি ইসলামের বিকৃতি ও অবনতির সময়ও ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থায় বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রবল মুসলিমবিদ্বেষী ঐতিহাসিক হ্যাভেলের একটি উক্তি তিনি তুলে ধরেছেন-'ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয় এর অন্তর্নিহিত কারণেই নিহিত ছিল। নবীর সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানকে দিয়েছে সমান আত্মিক মর্যাদা, ইসলামকে করেছে রাজনীতি ও সমাজনীতির মিলনভূমি আর তা-ই দিয়েছে তাকে জগৎ শাসনের ভার'।[৮] ভারতের বুকে ইসলাম কি পরিবর্তন এনেছিল সে বিষয়ে আবারও বিদ্দিষ্ট হ্যাভেলের স্বীকারোক্তি তুলে ধরেছেন- 'ভারতীয় হিন্দুদের জীবন থেকে মুসলমান রাজনৈতিক মতবাদ একদিকে জাতিভেদের গোড়ামী দূর করেছে অন্যদিকে অন্যায়ের প্রতি একটা বিদ্রোহের বীজও বপন করে দিয়েছে যা জন্ম দিয়েছে অগণিত দৃঢ় মানুষের, বহু মৌলিক প্রতিভার। মোটকথা বাঁচার আনন্দে পরিপূর্ণ এক বিরাট মানবতা'।

পরিশেষে তিনি ভারতবাসীরা মুসলমানদের অবদান স্বীকার না করে উল্টো যে উদ্ধতভাব পোষণ করে তাকে তিরস্কার করে বলেছেন, এটা একটা পরিহাস্য আচরণ এবং ইতিহাসের অবমাননাকারী যা ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে বিঘ্নিত করেছে। মূলতঃ প্রাচীন সভ্যতার বিশৃংখল ধ্বংসস্তুপ থেকে মুসলমানরাই হিন্দুদেরকে উদ্ধার করেছে। তাদের দেখিয়েছে নবআলোকের দিকদিশা যার তুলনা ইতিহাসে বিরল। তাই এক্ষেত্রে হিন্দুদের সংকীর্ণতাবোধ তাদের সত্যকে গ্রহণ করার অযোগ্যতাকেই সুস্পষ্ট করেছে। অপরদিকে এ বিষয়ে মুসলমানদের বিরাট একটি অংশের সীমাহীন উদাসীনতাও তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। আফসোসের সুরে তিনি লিখেছেন-'ইসলাম যে ইতিহাসের নাট্যশালায় মহিমাময় ভূমিকার অভিনয় করে গেল সে সম্পর্কে আমাদের কালের অত্যন্ত অল্পসংখ্যক মুসলমানই অবহিত'। এজন্য তিনি 'প্রতিক্রিয়াশীল আলেম'দের দোষারোপ করেছেন।

পাঠক বইটির প্রতিটি পাতায় লেখকের সুগভীর মমতাপূর্ণ বিশ্লেষণ দক্ষতায় মুগ্ধ হবেন। নির্মোহ অথচ সত্যানুসন্ধানী মূল্যায়নধর্মী রচনাভঙ্গি লেখকের প্রতি নিমিষেই শ্রদ্ধা জাগায়। খুব নিকট থেকেই ইসলামকে দেখার চেষ্টা করেছেন বলে তার কাছে এমন অনেক সত্য প্রতিভাত হয়েছে যা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেকটা দায়িত্ব নিয়েই তিনি ইসলামের সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সব ছাপিয়ে যে সত্যটি মূর্ত হয়ে উঠেছে তা হল, একজন আপাদমস্তক কম্যুনিস্ট ও নাস্তিক হয়ে তিনি ইসলামকে যে দূরদৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন, একত্ববাদের মূলসূত্রকে যে গভীরতায় আত্মস্থ করেছেন, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের যে জটিলতামুক্ত, ক্লান্তিহীন, সহজ-সরল চিত্র এঁকেছেন মুসলমান হয়েও এ বিষয়গুলো আমাদের চোখে খুব কমই ধরা পড়ে। ইসলামকে আজ আমরা এমন এক অঙ্গনে ফেলে রেখেছি যেখানে তা অন্যান্য ধর্মের মত কতিপয় বিমূর্ত বিশ্বাসের আকার নিয়ে দাড়িয়ে আছে। ব্যক্তিগত জীবনে কিছু আচার শিখান ও শিথিল মূল্য আরোপ ছাড়া তাতে যেন কোন শক্তিময়তা নেই। নেই তাতে সমাজ পরিশুদ্ধির সর্বব্যাপিতা। নেই তাতে সত্যের সেই অপার্থিব তূর্যঝংকার যার স্পর্শে আন্দোলিত হতো শতকোটি বুভুক্ষ প্রাণ। নেই তাতে মিথ্যা, অন্যায় আর বেইনসাফীর বিরুদ্ধে সেই বৈপ্লবিক রুদ্র হংকার, যার বিদ্যুৎতরঙ্গে পরিবাহিত হয়েছিল এককালে কল্যাণ ও প্রশান্তির অনাবিল সুবাতাস। স্বার্থদ্বন্দ্বে মুখর মুসলিম বিশ্ব এবং নামধারী মুসলমানদের জন্য লেখকের চিন্তাধারাগুলো তাই চপেটাঘাতই।

অপরদিকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের গোঁড়া সমর্থক হিসাবে লেখক বইটির কোথাও নিজ গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। ফলে চিন্তাধারায় বহু বিকৃতি রয়েছে যা আমরা আলোচনায় দেখেছি। মহাসত্যের মৌলিক উৎসের এত কাছাকাছি হয়েও এসব বরেণ্য মনীষীদের সত্যকে ধারণ করতে ব্যর্থ হওয়ার করুণতর এ দিকটিও আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়। কেবলমাত্র বিশ্বাস নামক প্রাণশক্তির অভাবে মানুষ কিভাবে সত্য গ্রহণে বাধাগ্রস্থ হয় তা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। তাই গ্রন্থটি পাঠে বোদ্ধা পাঠক মানবতার মূল প্রাণশক্তি তথা আসমানী সত্যের উপর বিশ্বাসের মর্যাদা উপলব্ধির ভিন্নতর তাকীদ অনুভব করবেন।

সব মিলিয়ে নানা ত্রুটি সত্ত্বেও সংক্ষিপ্ত এই বইটি লেখকের মৌলিক উদ্দেশ্য প্রতিফলনে স্বার্থকতারই পরিচয় বহন করেছে। অনুবাদক আব্দুল হাই লেখকের বক্তব্যের মূলধারাকে ফুটিয়ে তুলতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও সবক্ষেত্রে সে ধারা অক্ষুণ্ন থাকেনি। কিন্তু তার ঝরঝরে অনুবাদ পাঠককে তৃপ্তই করবে।

---

6. For that credit he has gone down in history as the founder of the purest form of religion. Because Islam as a religion is Irrationalism par excellence, it so easily triumphed over all other religions which, with all their metaphysical accomplishments, theological subtleties and philosophical pretensions, were defective as religion, being but pseudo-religions.
7. The latest of Great Religions, Islam was the greatest; and as such destroyed the basis of all religions. That is the essence of its historical significance.
8. The social program of the Prophet gave every true believer an equal spiritual status made Islam a political and social synthesis and gave it an imperial mission Islam was a rule of life sufficient for the happiness of average humanity content to take the world as it is.

আরবী অভিধানচর্চা : সূচনা ও বিকাশ

নূরুল ইসলাম

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম চীনে অভিধানচর্চার শুভ সূচনা হয়। খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে বাউতিশি নামক জনৈক ভাষাবিদ ৪০ হাযার শব্দ সম্বলিত একটি অভিধান রচনা করেন। অতঃপর ওয়ারু নামক বিদ্বান ল্যাটিন ভাষায় 'লিঙ্গুয়া ল্যাটিনিয়া' (Lingua Latinia) নামে একটি অভিধান রচনা করেন। ১৭৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীক ভাষাবিদ ইউলিউস বুলাকিস গ্রীক ভাষায় আরেকটি অভিধান প্রণয়ন করেন।

কুরআন মাজীদের দুর্বোধ্য শব্দাবলীর অর্থ ছাহাবায়ে কেরাম না জানলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছ থেকে জেনে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের পর বিশিষ্ট ছাহাবীগণ এ দায়িত্ব পালন করতেন। বর্ণিত আছে যে, একদা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) কা'বা প্রাঙ্গণে জনগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসা ছিলেন। লোকেরা তাঁকে কুরআনের তাফসীর জিজ্ঞাসা করছিল। ইত্যবসরে নাফে ইবনুল আযরাক নাজদা ইবনু উ'আইমিরকে বলল, যিনি কুরআনের তাফসীর করছেন তার কাছে চলুন। তারা তাঁর কাছে গিয়ে বলল, আমরা আপনাকে কুরআন মাজীদের কতিপয় আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করব। আপনি আমাদেরকে তার তাফসীর করবেন এবং আরবদের কবিতা দ্বারা তার সত্যতা প্রমাণ করবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন। তাদের কথা শুনে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, তোমরা যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর। নাফে বললেন, আল্লাহর বাণী: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِـــزِينَ 'দক্ষিণ ও বামদিক হতে, দলে দলে' *(মা'আরিজ ৩৭)* সম্পর্কে বলুন! ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, العزون: حلق الرفاق 'আযূন অর্থ: বন্ধুদের একত্রিত হওয়া'। নাফে বললেন, আরবরা কি এ অর্থ জানত? ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, তুমি কি উবাইদ ইবনুল আবরাছ-এর এ কবিতা শোননি-

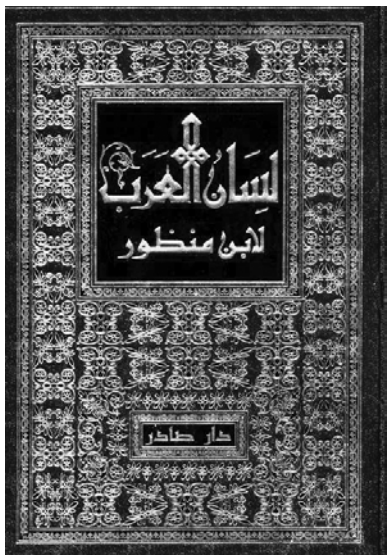

فجاءوا يهرعون إليه حتى + يكونوا حول منبره عزينا.

'তারা তার দিকে ছুটে আসল। এমনকি তার মিম্বারের চতুর্পার্শ্বে দলবদ্ধ হল'। এরপর নাফে বললেন, আল্লাহর বাণী لكل جعلنا منكم شرعة ومنـــهاجا 'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী'আত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি' *(মায়েদা ৪৮)* সম্পর্কে বলুন! তিনি বললেন, الشرعة : الدين والمنهاج: الطريق। الشـــرعة হচ্ছে দ্বীন আর المنـــهاج অর্থ রাস্তা'। নাফে বললেন, আরবরা কি এ অর্থ জানে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তুমি কি সুফইয়ান ইবনুল হারিছ (রাঃ)-এর এ কবিতা শোননি-

لقد نطق المأمون بالصدق والهدى + وبين للإسلام دينا ومنهاجا.

'মামূন [অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)] সত্যবাদিতা ও হেদায়াতের কথা বলেন এবং তিনি ইসলামকে ধর্ম ও সরল পথ হিসাবে বর্ণনা করেন'। অতঃপর নাফে বললেন, আল্লাহ্র বাণী أنظروا الي ثمره إذا أثمر وينعـــه 'লক্ষ্য কর, উহার ফলের প্রতি যখন উহা ফলবান হয় এবং উহার পরিপক্বতা প্রাপ্তির প্রতি' *(আন'আম ৯৯)* সম্পর্কে বলুন! ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, نضـــجه وبلاغـــه 'উহার পরিপক্বতা বা পুষ্ট হওয়া'। নাফে বললেন, আরবরা কি এ অর্থ জানে? ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, তুমি কি কবির নিম্নোক্ত কবিতা শোননি-

إذا ما مشت وسط النساء تأودت + كما اهتز

غصن ناعم النبت يانع.

এভাবে একের পরে এক ইবনু আব্বাস (রাঃ) কুরআন মাজীদের ২৫০টি দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা করেন প্রাচীন আরবী কবিতা দ্বারা *(বিস্তারিত দ্রঃ আল-ইতক্বান ১/২৫৫-২৮২, ৩৬ নং প্রকার 'ফী মা'রিফাতে গারীবিহি)*। এথেকে বুঝা যায় যে, কুরআন মাজীদের দুর্বোধ্য, জটিল, কঠিন ও অপরিচিত শব্দের ব্যাখ্যাকল্পে আরবী অভিধানচর্চা সূচনা হয়। Amidu Sanni বলেন, Explanation of the Quranic idioms and usages was the first chapter in Arabic Lexicograply. *(Islamic Studies, Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan, Vol. 13. No.2, 1992, P. 144).*

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) আরবী অভিধানচর্চার বীজ বপন করেন। তারপর আবূ সাঈদ আব্বাস ইবনু তাগলিব (মৃ. ১৪১হিঃ/৭৫৮ খৃঃ) তার পদাংক অনুসরণ করে 'গারীবুল কুরআন' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করে কুরআন মাজীদের দুর্বোধ্য ও অপরিচিত শব্দের ব্যাখ্যা করেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে আরবী অভিধানচর্চা মৌখিকভাবে চলতে থাকে। আরবী ভাষাবিদগণ মরুভূমিতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে যেসব শব্দ শুনতেন তা লিপিবদ্ধ করতেন। এক্ষেত্রে যে সকল ভাষাবিদ পণ্ডিত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন আল-খাছ'আমী, 'কিতাবুল হাশারাত' প্রণেতা আবূ খায়রাহ আল-আদাবী, আবুদ দাকীস, আবু মাহদিয়্যাহ আল-আরাবী, আবুল মুন্তাজা', আবুল বায়দা আর-রায়াহী, আবু তুফাইলা, আবু হায়াত আল-ফাক'আসী, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল

মালেক, 'আন-নাওয়াদির' প্রণেতা আমর ইবন কারকারা, আবূ যিয়াদ আল-কিলাবী, আবূ আমর ইবনুল আলা প্রমুখ।

প্রাথমিক যুগে ভাষাবিদগণ একই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শব্দ সংগ্রহ করে গ্রন্থাবদ্ধ করতেন। যেমন- আল-আছমা'ঈ (মৃ. ২১৫হিঃ) النخل (খেজুর), الكرم (আঙ্গুর), الإبل (উট), الخيل (ঘোড়া) প্রভৃতি বিষয়ে পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এভাবে জাহিলী যুগ থেকে উমাইয়া যুগ পর্যন্ত আরবী অভিধানচর্চা মৌখিকভাবে চলতে থাকে। আব্বাসীয় যুগে এসে আরবী অভিধান সংকলনের কাজ শুরু হয়। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন খলীল ইবনু আহমাদ আল-ফারাহীদী। তাঁকে আরবী অভিধান শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনিই 'কিতাবুল আইন' নামে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আরবী অভিধান রচনা করেন।

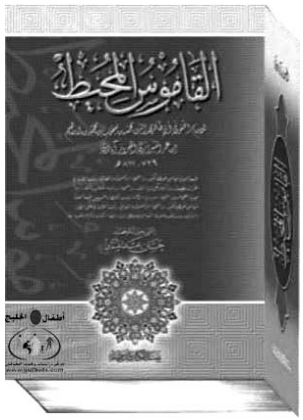

খলীল ইবনু আহমাদ উচ্চারণস্থল ভিত্তিক আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে তার অভিধানকে এক ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে সাজিয়েছেন। তিনি আলিফ, বা, তা, ছা..... এরূপ গতানুগতিকভাবে না সাজিয়ে ছহীহ বা নিরেট বর্ণসমূহের মধ্যে প্রথম ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত হরফগুলো সাজিয়েছেন। এরপর মু'তাল বা পরিবর্তনশীল বর্ণসমূহকে শেষে রেখেছেন। তার বিন্যাস পদ্ধতি নিম্নরূপ:

ع، ح، ه، غ، خ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، س، ز، ط، ت،د، ظ، ث، ذ، ر، ل، ن، ف، ب، م، ا، و، ى، ء.

এভাবে প্রথম ২৫টি নিরেট বর্ণ দ্বারা ২৫টি অধ্যায় এবং শেষ চারটি মু'তাল বর্ণ দ্বারা একটি মোট ২৬টি অধ্যায় রচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায় 'আইন' বর্ণ দ্বারা শুরু করার কারণে অভিধানটির নামকরণ হয়েছে 'কিতাবুল আইন'। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর ভাষ্যমতে এ অভিধানটির শব্দ সংখ্যা ১,২৩,০৫,৪১২ (এক কোটি তেইশ লাখ পাঁচ হাযার চারশত বারটি)। তবে আবূ বকর আয-যাবীদীর মতে ৬৬,৯৯, ৪০০টি।

খলীল ইবনু আহমাদের পর আরবী অভিধানচর্চা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি-অগ্রগতির পথ পাড়ি দিয়ে পূর্ণতার দিকে ধাবিত হয়। অভিধানবিদগণ শব্দসমূহকে গ্রন্থাবদ্ধ করতে গিয়ে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যথাঃ-

১. মাদরাসাতুত তাকলীবাত আছ-ছাওতিয়্যাহ : খলীল ইবনু আহমাদ এ রীতির উদ্ভাবক ও পথপ্রদর্শক। পরবর্তীতে আবূ আলী আল-কালী (মৃ. ৩৫৬হিঃ) 'আল-বারি' অভিধানে, আল-আযহারী 'তাহযীবুল লুগাহ', ইবনু সীদাহ 'আল-মুহকাম' এবং ছাহিব ইবন আববাদ (মৃ. ৩৮৬ হিঃ) 'আল-মুহীত' অভিধানে তার পদাংক অনুসরণ করেন।

এ রীতির অনুসারীরা প্রত্যেকটি শব্দ ও তার পরিবর্তিত রূপগুলোকে মাখরাজের দিক দিয়ে যে অক্ষরটি সবচেয়ে বেশী দূরবর্তী তার অধীনে একত্রিত করেছেন। যেমন كبر শব্দটি ও তার পরিবর্তিত রূপ كـــرب- ركب-ربك- بكـــر- بـــرك প্রভৃতি শব্দগুলোকে 'কাফ' হরফের অধীনে একত্রিত করা হয়েছে। কেননা এটির উচ্চারণস্থল জিহ্বার শেষপ্রান্ত।

২. মাদরাসাতুত তাকলীবাত আল-হিজাইয়্যাহ : 'জামহারাতুল লুগাহ' শীর্ষক অভিধান রচয়িতা ইবনু দুরাইদ (মৃ. ৩২১) এ রীতির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শব্দের পরিবর্তিত রূপের ক্ষেত্রে খলীল ইবনু আহমাদের রীতি অনুসরণ করেন। তবে পার্থক্য এই যে, ইবনু দুরাইদ আরবী বর্ণমালার সাধারণ বিন্যাস বজায় রেখেছেন। এ পদ্ধতির অনুসারীরা كرب-ركب-ربك-بكر- برك শব্দগুলোকে 'বা' হরফের অধীনে সংকলন করেছেন। কেননা এটি বর্ণমালার ধারাবাহিকতায় অগ্রগণ্য। 'জামহারাতুল লুগাহ' ছাড়া এ রীতি অবলম্বনে রচিত বিখ্যাত অভিধান হচ্ছে আহমাদ ইবনু ফারিস রচিত 'মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ' ও 'কিতাবুল মুজমাল ফিল-লুগাহ'।

৩. মাদরাসাতুল কাফিয়া : 'তাজুল লুগাহ ওয়া ছিহাহুল আরাবিয়্যাহ' অভিধান রচয়িতা ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী (মৃ. ৩৯৮ হিঃ) এ পদ্ধতির উদ্ভাবক। এ রীতি অনুযায়ী শব্দের শেষ অক্ষরকে 'বাব' ও প্রথম অক্ষরকে 'ফাছল' হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। শব্দের শেষ অক্ষর অনুযায়ী বিন্যস্ত করার কারণে এ পদ্ধতিকে 'মাদরাসাতুল কাফিয়া' হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। এ রীতি অনুযায়ী كبر শব্দটি باب الراء ও فصل الكـــاف এ উল্লিখিত হয়েছে।

এ পদ্ধতিতে রচিত বিখ্যাত অভিধান হচ্ছে ইবনু মানযূর প্রণীত 'লিসানুল আরাব', মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদীর 'আল-কামূসুল মুহীত', আয-যাবীদীর 'তাজুল আরূস' এবং আহমাদ ফারিস আশ-শিদয়াকের 'আল-জামূস আল-কামূস' প্রভৃতি।

৪. মাদরাসাতুল হিজাইয়্যাহ আল-আদিয়া : আরবী অভিধান রচনায় অনুসৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এ পদ্ধতিটি সবচেয়ে সহজ। এটি আরবী বর্ণমালার সাধারণ বিন্যাস তথা أ-ب-ت-ث-ج..... এভাবে শব্দগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ রীতি অনুযায়ী শব্দের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী শব্দ বিন্যস্ত করা হয়েছে। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেমন رمـــى শব্দটিকে খুঁজতে গেলে 'রা' দ্বারা খুঁজতে হবে। মুহাম্মাদ ইবনু তামীম আল-বার্মাকী 'আল-মুন্তাহা ফিল-লুগাহ' ও যামাখশারী 'আসাসুল বালাগাহ' অভিধানে এ রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

আধুনিক যুগে এ পদ্ধতি অনুসারে প্রণীত অভিধানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'আল-মিছবাহুল মুনীর', বুতরুসুল বুস্তানী প্রণীত 'মুহীতুল মুহীত', সাঈদ শারতূনীর 'আকরাবুল মাওয়ারিদ', ফাদার লুইস মা'লূফ (মৃ. ১৯৪৬ খৃ.) প্রণীত 'আল-মুনজিদ', 'আল-মু'জামুল ওয়াসীত' প্রভৃতি। শেষোক্ত অভিধানটি বর্তমান যুগে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত।

আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ অভিধানসমূহের তালিকা :

রচয়িতা	অভিধানের নাম
খলীল ইবনু আহমাদ	কিতাবুল আইন
আল-জাওহারী	আছ-ছিহাহ
ইবনু মানযূর	লিসানুল আরাব
আল-ফিরোযাবাদী	আল-কামূসুল মুহীত
লুইস মা'লূফ	আল-মুনজিদ
ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য	আল-মু'জামুল ওয়াসীত

ISLAM ON TRADE & COMMERCE

MJ Mohamme

Islam provides a comprehensive code of conduct and perfect way of life for entire mankind of all times. It conforms to naturality and shuns ostensibility. Unity, universality, rationality, internationality, practicality, honesty, simplicity and moderation are some of the sound factors of the faith of Islam. Most of the main character of the ideals of universal brotherhood, international citizenship and the concept of one world are the most important and the unique characteristic of Islam and it is the fusion of spirit and matter.

It is a clear truth that some of the faiths in the world are sound in theory and feeble otherwise. Islam being the natural religion promotes and infers temperance and moderation in all walks of life and in all spheres of human activity.. Its teachings are simple, easy and understandable to believe, accept and practice as Holy Qur'an says: "Allah desireth for your ease; He desireth not hardship for you" (2:185)

It works over to the credit of Prophet Muhammad (PBUH) to have established by precept and practice a deep feeling for divine inherent in the social order and in the row of heirachy in the dealings of politics, human rights and economic transaction. Thus Almighty unfolded the gate of divine laws to prepare honest, sincere, good and useful citizen in the state.

The rights of life, liberty and property of an individual are firmly established so as to promote maximum identity of the public and private interest in the polity of Islam. Qur'an and sunnah are ways and means to guide mankind on straight path as Holy Qur'an says: "Say (to them) by whose order have you denied yourself those amentities which God had created for His people and those good things to eat and use (which he made for you)" (7:32)

"Eat and drink, but exceed not (and become extravagant)" (7:31).

"Our Lord give us the good in this world and the good in hereafter" (2:201).

Prophet Muhammad (PBUH) said: "The Muslim who lives in the midst of society and bears with fortitude the afflictions that come to him is better than the one who shuns society and cannot bear any wrong done to him".

Role of Trade and Commerce

Commerce plays an important role in the Islamic economic system. The Prophet (PBUH) was once asked which was the best income, and he said: "A man's handiwork and all clean sales". Thus the goal which Islam strives for in commerce is exchange of utilities among the members of the society, based on brotherhood and justice. Towards this goal, Islam has set certain regulations and principles, which control the activities of merchants. There are many references made by the Prophet (SM), such as :

"Allah Blesses a person who is Allah conscious when he sells, buys and examines". And,"Trade is by mutual consent as long as the parties do not dispute. If they are faithful and announce their dealings, they are blessed, but if they conceal them and tell lies, the blessing is blotted out."

The Prophet (SM) has strongly warned whomever plays foul or indulges in corrupt practices in business because it is offending the principles of Islam. He said: "Whoever corrupts us is not one of us". It is also reported through Hazrat Abdulla Bin Masoud that the Prophet (SM) had said: "Charity given from income earned illegally is not acceptable, if one spends it, it is not blessed, and if he carries it on his back, he is then carrying a load of fire. Allah does not blot out sin with sin but blots out sin with good deeds". Indulge offend Charity

The Law has set the principles, which ensure the brotherly understanding and solidarity among the parties to the business. For example, the law requires that business dealings should be contracted between the parties to ensure justice. The Prophet (SM) has also recommended that merchants should sell at justifiable prices so that the poor should be able to purchase their requirements. He said: "A person would enter in the Heavens because during his life time he used to sell to people at justifiable price, grant them loans, give them relief and forgive the poor."

It is essential that merchant's activities should emerge from spiritual consciousness especially when he is dealing with the poor and the oppressed. This is Allah's cause, and in this regard the Prophet (SM) places such type of people in the same class with those who fight in the cause of Allah, who slay and be slain. He said: "Glad tidings; he who comes to our market is like one who strives in the cause of Allah, but the monopolist in our market is like a pagan in the Allah's Book."

The law stipulates that the price of a commodity must be the same whether in cash transactions or on account, because those who purchase on loan are poor people who cannot afford to pay in cash, thus it is improper to exploit them by taking advantage of their poverty. The Quran says : "If the debtor is in a difficulty, grant him time till it is easy for him to repay, but if ye remit it by way of charity, that is best for y our if ye only knew." [2 : 280] stipulate commodity transaction afford exploit debtor remit

On the other hand, the law provides many benefits to merchants in return for their obligations. Those who suffer financial difficulties are to be treated with patience. The Prophet (SM) had ordered that the government should assist merchants who have become bankrupt; and in the event of death of a bankrupt

merchant, the government should pay off his debts. Also the law forbids the sale of the property of the deceased merchant in order to pay his debts. The Prophet (SM) said: "I am the most exalted among the believers, if believer dies, I have to pay his debts, and if he leaves property, it is for his heirs." Thus it is clear that the law has made the Commercial relations between the seller and the buyer based on the principle of justice to ensure unity and brotherhood. Those principles are as follows:

(a) All merchants in the market must have equal opportunities. The Prophet (SM) had ordered that all commercial activities should take place only in the market, so that there would be no chance for some merchants to divert the market in order to increase the prices.

(b) The prices should be decided according to the law of supply and demand. If, in any event, some merchants take advantage of certain situations, then the government must intervene to ensure justice n prices.

(c) The law forbids any type of monopoly and it considers it a serious crime because it prevents lawful transactions and equal opportunities for all engaged in business. It also leads to centralization of authority and power in the hands of a few rich people who always take advantage of such opportunities for their own benefit as against the general good of the society. And because of the danger of this offence, the Prophet (SM) has warned saying:"Whoever monopolizes (by hoarding) food things for 40 days will be isolated from Allah, and Allah Himself will isolate from him." intervene centralization hoarding isolate

(d) Prophet (SM) has prohibited any type of price competition, because competition only serves personal selfish ends, and causes conflicts and divisions between the merchants. The competition, which is allowed, is that ***which seeks to improve the quality of the commodities. That will be a healthy and lawful competition***.

Hence, it is understood that Islam developed very wonderful trade, fifteen centuries before itself and standing as a role model for the current day's system. Also one should note that Islam's economic development is based on the principle of solidarity, brotherhood and justice and always propagates the practice of good moral and ethical values.

(Collected from Gulf news)

Vocabulary : শব্দার্থ

শব্দ	বাংলা অর্থ	আরবী অর্থ
comprehensive	সমন্বিত/উপলব্ধিযোগ্য	شامل،واسع الإدراك
shun *vt* (-nn-)	দূরে থাকা,পরিহার করা	يجتنب، ينأي (عن)
ostensibility *n*	বাহ্যিক প্রদর্শন,	ظهورية ، زعم
simplicity *n*	সহজতা, সারল্য	بساسة ، سجاجة
fusion *n*	সংমিশ্রণ,একীভূত গলন	صهر، اندماج
feeble *adj*	দুর্বল, নিস্তেজ, ক্ষীণ	ضعيف، غير فعال
infer (from,that) vt (rr) inference	অনুমান করা, সিদ্ধান্তে আসা	يستدل، يلمح (الي)
temperance	সংযম, মিতাচার	الاعتدال
sphere *n*	সীমা, ব্যাপৃতি, বলয়	منطقة، مترلة
inherent *adj*	স্বাভাবিক, সহজাত	متأصل، فطري
hierarchy *n* (হায়ারারকি)	কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি	التسلسل الهرمي، السلطة
transaction	লেনদেন, কার্যবিবরণী	معاملة تجارية، إجراء
unfold *vt, vi*	খোলা, উন্মোচন করা, প্রকাশ করা বা হওয়া	يكشف، يوضح
amenity *n* amentities	উপভোগ্য, মনোরম জিনিস। যেমন- উদ্যান	لياقة
fortitude *n*	বিপদের মুখে ধৈর্য।	ثبات
affliction *n*	পীড়া, দুর্ভোগ	حزن ، بلوي، مرض
strive *n* striver (উদ্দ্যমী)	লড়াই/সংগ্রাম/যুদ্ধ করা	يكافح
exchange *n vt*	বিনিময়	تبادل، صرف
utility *n*	উপযোগিতা, উপযোগ	منفعة، فائدة
regulation *n*	নিয়ম,নিয়ন্ত্রণ,বিধিসম্মত	قانون، تنظيم
conscious *adj*	সচেতন, সজ্ঞান	مدرك، شاعر (ب)
consent *vi n*	রাজী হওয়া, সম্মতি	يوافق، موافقة
dispute *n vt vi*	বিতর্ক, যুক্তি, বিরোধ, জয়ের জন্য চেষ্টা করা	يتجادل، يدافع
announce *vt*	ঘোষণা করা	يذيع، يدل علي،
conceal *vt*	গোপন করা	يخفي
blot n *vt*	দোষ, ত্রুটি বা কলঙ্ক, আড়াল করা, ধ্বংস করা	محو ، يمحو، يلطخ
indulge *vt vi* indulgecne	চরিতার্থ করা, প্রশ্রয় দেওয়া	ينغمس، يتساهل مع
offend *vt vi*	আইন/নিয়ম লংঘন করা	ينتهك، يذنب
solidarity (with)	সংহতি	التكافل، التماسك
justifiable *adj*	সত্যতা প্রতিপাদক কাজ	ممكن تبريره
purchase *n vt*	ক্রয়,ক্রীত বস্তু,ক্রয় করা	يشتري ، شراء
emerge *vi*	প্রকাশিত/আবির্ভূত হওয়া	ينبثق، ينشأ
oppress *vt*	অত্যাচার/ভারাক্রান্ত করা	يضطهد، يظلم
strive(with/against	সংগ্রাম/ যুদ্ধ করা	يكافح
monopoly *n*	একচেটিয়া/একচ্ছত্র অধিকার	احتكار
stipulate *vt vi*	চুক্তির শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা	يتعاهد علي، يشترط
afford *vt* (with can/be able to)	সামর্থ থাকা (অর্থ/সময়)	يمنح، يتحمل، يقدر علي
exploit *n vt*	বীরত্বপূর্ণ কাজ, (সম্পদ) কাজে লাগানো	يستغل، يستثمر
debtor (debt n)	ঋণী, ঋণ	دين
remit vt ,vi	(ডাকযোগে অর্থ) প্রেরণ করা, ক্ষমা/ মওকুফ করা	يغفر ، يؤجل
assist vt vi	সাহায্য, সহযোগিতা করা	يساعد
exalt vt	পদোন্নতি দেওয়া, উচ্চপ্রশংসা করা	يمجد، يرفع
heir n	উত্তরাধিকারী	وارث
divert vt (from)	গতিপথ/মনোযোগ পাল্টে দেওয়া	ينحرف، يحول
intervene vt	হস্তক্ষেপ করা/ মধ্যস্থ হওয়া	يتخلل، يتدخل
isolate *vt*	পৃথক/বিচ্ছিন্ন করা	يعزل، يفصل
propagate *vt vi*	প্রচার করা,বিস্তার করা	ينشر، يمد

আলোকপাত

???? আমি বর্তমানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র । পাঁচ বছর পূর্বে আমি যাবতীয় পাপকাজ থেকে তওবা করে আল্লাহর অশেষ রহমতে দ্বীনের প্রতি পূর্ণভাবে অবিচল থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি দাড়ি রেখেছি এবং ইসলামী আদব-কায়দাগুলো রপ্ত করেছি। কিন্তু দুঃখজনক হলো আমার পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব আমার এই পরিবর্তনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে এবং আমাকে উপহাস করে। এসব বাধাকে আমি দ্বীনের খাতিরে কিছুই মনে করি না। কিন্তু একদিন এক দুঃসম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে বিদ্রুপের স্বরে মাওলানা সাহেব, হুজুর সাহেব ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। আমি ক্রমাগতভাবে কয়েকদিন হাসিমুখেই উত্তর দিয়েছি যে, আমি তো আপনার অভিভাবক (মাওলা) নই বা আমি উঁচু দরের সম্মানিত (হুজুরে আ'লা) কেউ নই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ক্রোধের স্বরে একদিন আমি তাঁকে এ আচরণ পরিত্যাগ করতে বললাম এবং বললাম আমি যদি একজন ফাসিক, বেদ্বীন হতাম আপনি কি এভাবে আমাকে বিদ্রুপ করতে পারতেন? আমি সেদিন থেকে তার সাথে আর সম্পর্ক না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদিও আমি সবসময় তাঁর হেদায়াতের জন্যই দো'আ করি। আমার এ ধরণের আচরণ বা সিদ্ধান্ত কি ঠিক হয়েছে?

- আরীফুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আপনাকে মুবারকবাদ জানাই দ্বীনের পথে ফিরে আসা এবং তার উপর অটলভাবে টিকে থাকার দৃঢ় মানসিকতা অর্জনের জন্য। আল্লাহ আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করুন। আপনি আপনার নিকটজনদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে উপহাসের শিকার হয়েছেন তা দ্বীনের পথের পথিকদের জন্য অতি স্বাভাবিক একটি বিষয়, যা থেকে নবী-রাসূলগণ ও তাদের অনুগামীগণ কেউই পরিত্রাণ পাননি। পৃথিবীবাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও নবী-রাসূলদের এমন একজন ছিলেন না যিনি স্বীয় কওমের দ্বারা লাঞ্ছিত হননি। এমনকি সাধারণভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ জ্ঞানী-মনীষীদেরকে এ ধরনের অভিজ্ঞতা বরণ করতে হয়েছে। অতএব কষ্ট অনুভবের প্রয়োজন নেই। আপনি সর্বোচ্চ কল্যাণের পথে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, ভ্রষ্টতা তথা শয়তানের পথ পরিহার করে ছিরাতে মুস্তাকীম তথা আল্লাহর পথে যাত্রা শুরু করেছেন, এটাই আপনার জন্য মহাসৌভাগ্যের বিষয়। এ পথে আপনার সামনে বহু বাধা-বিপত্তি আসবে। মুমিনদের প্রতি কাফিরদের এরূপ উপহাসের বিবরণ তো পবিত্র কুরআনেই এসেছে, 'যারা অপরাধী তারা মুমিনদের দেখে উপহাস করত। তারা যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার সময়ও তারা হাসাহাসি করত। মুমিনদেরকে দেখে তারা বলত, এরা তো নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্ট' *(তাত্বফীফ ২৯-৩১)*। আর আল্লাহও বলেছেন যে, তিনি নিজেই তাদের প্রতি পরিহাসকারী এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশদানকারী যাতে তারা সীমালংঘনে মত্ত হয়ে থাকতে পারে *(বাক্বারা ১৪-১৫)*। অতএব তাদের মূর্খতা, অজ্ঞতাকে গুরুত্ব না দিয়ে কুরআনের ভাষায় তাদেরকে 'সালাম' বলে নম্রতার সাথে এড়িয়ে চলুন *(হূদ ৬৯, ফুরক্বান ৬৩, ক্বাছাছ ৫২)*। কেননা তারা তো শয়তানের ফেরে পড়ে স্বীয় প্রবৃত্তির পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে যেখান থেকে আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং তাদের সাথে নম্র ও রহমদিল হয়ে কথা বলুন। উদ্ধত আল্লাহদ্রোহী ফেরাউনের সাথে নবী মূসা ও হারুণ (আঃ)-এর বিনম্র আলাপচারিতা থেকে শিক্ষা নিন। তবে এসব পরিস্থিতিতে অবশ্যই নিজেকে দুর্বল ও অপমানিতভাবে উপস্থাপন করবেন না। প্রয়োজনে কঠোর হবেন। যেভাবে রাসূল (সাঃ) কা'বা ঘরে কাফিরদের ক্রমাগত বিদ্রুপবাণে অতিষ্ঠ হয়ে হঠাৎ একদিন তীব্র ক্রোধ প্রকাশ করেন যা ছিল কাফিরদের কাছে বজ্রপাত সমতুল্য। এতে তারা ভীত ও লজ্জিত হয়ে স্থান ত্যাগ করেছিল। সুতরাং সংশোধনের উদ্দেশ্যে এসব অজ্ঞদের প্রতি সাময়িক কঠোরতা প্রকাশ করতে পারেন। এছাড়া তাদের প্রতি আপনার কিছু কর্তব্য রয়েছে। যেমন- (১) আন্তরিকভাবে সদুপদেশ দেয়া। (২) উপহার সামগ্রী দেওয়া বা বাড়িতে দাওয়াত করা যাতে তাদের অন্তরের পীড়া দূরীভূত হয়। (৩) প্রয়োজনীয় বই পড়তে দেওয়া। (৪) সবসময় তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হেদায়াত প্রার্থনা করা। (৫) দ্বীনী বৈঠকসমূহে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

এভাবে আল্লাহ হয়তো আপনার মাধ্যমে তার জন্য হেদায়াতের পথ খুলে দিবেন। যার চেয়ে কল্যাণকর কোন বিষয় আপনার ও তার জন্য কিছুই হতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি আল্লাহ তোমার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে হেদায়াত লাভ করান তবে তা তোমার জন্য লাল উটের (অতি মূল্যবান জিনিস) চেয়েও উত্তম হবে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৮০)*। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের দ্বীনের উপর দৃঢ়চিত্তভাবে কায়েম থাকার তাওফীক দিন এবং পথভ্রষ্টদেরকে পথপ্রদর্শন করুন। আমীন!

???? দেশ-বিদেশে জঙ্গী কার্যকলাপ শুরু হওয়ার পর বিশেষতঃ ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আমি দ্বীনের প্রতি মানসিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়েছি এবং আল্লাহর সাহায্য থেকে হতাশ হয়ে গেছি। আমি কিভাবে এ মানসিক ত্রুটি কাটিয়ে উঠব? দ্বীনের উপর সার্বক্ষণিক অটল থাকতে আমার করণীয় কি?

-আব্দুর রাকীব
কাকডাঙ্গা,সাতক্ষীরা

এ ধরনের মনোঃপীড়া, উদ্বেগ-পেরেশানীতে আপনার মত অনেক মুসলমানই আক্রান্ত। এটা কেবল আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে স্বল্প ধারণা, চিন্তার অগভীরতা ও অন্তরের সংকীর্ণতারই ফলশ্রুতি। দুর্ভাগ্যজনক যে, বহু মুসলমান ইসলামকে তাদের পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার মনে করে *(যুখরুফ ২৩)*। মূলতঃ এ দ্বীন আল্লাহর শক্তি ও ইজ্জতের বদৌলতে চিরঞ্জীব ও চিরবিজয়ী। এতে কোন পরাজয় নেই। কেননা মানবতার চূড়ান্ত বিজয় পরকালীন মুক্তিতেই নিহিত, দুনিয়াবী ক্ষমতা বা সম্পদের মাঝে নয়।

বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহ যে জাগতিক শক্তিতে পিছিয়ে রয়েছে এটা কেবল তাদের ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই। মুসলিম হিসাবে আমরা শর্তগুলো পূরণ করতে পারলেই আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য নেমে আসবে *(নূর ৫৫)*। বর্তমান অবস্থায় আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথ থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে আমরা কিভাবে আল্লাহর সাহায্য আশা করতে পারি?

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা মুসলিম বিশ্বের জন্য বিপদ ডেকে আনলেও বহু ইতিবাচক এবং ইসলামের জন্য কল্যাণকর বিষয়েরও সূচনা করেছে। গত ৮ বছরে খৃষ্টান ও ইহুদী বিশ্ব মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যেভাবে নিজেদের পুরানো হিংসাত্মক চেহারা উন্মোচন করেছে তাতে সারাবিশ্বে স্পষ্ট হয়ে গেছে আধুনিক সভ্যতার দাবীদারদের অসার বাগাড়ম্বরতা। ফলে একদিকে যেমন পশ্চিমারা নতুনভাবে ইসলামকে জানার চেষ্টা করছে এবং তাদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা পূর্বের চেয়ে অনেকগুন বেড়ে গেছে। অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও আলহামদুলিল্লাহ দ্বীনের প্রতি সচেতনতা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী

জাগ্রত হয়েছে। অতএব আল্লাহর সাহায্য থেকে হতাশ হওয়ার কারণ নেই *(হিজর ৫৫-৫৬)*। বস্তুত প্রকৃত সত্যের পথে ধাবমান একজন মু'মিন সবসময়ই বিজয়ী *(আলে ইমরান ১৩৯)*।

আপনি দ্বীনের প্রতি দৃঢ়কদম হওয়ার জন্য করণীয় জানতে চেয়েছেন। এজন্য প্রাথমিক শর্ত হলো ইসলামের দিকে পুরোপুরি ফিরে আসা এবং চলার পথকে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী পরিশুদ্ধ করা। আর প্রয়োজন হলো, নিজেকে সার্বক্ষণিক অনুশীলনের মধ্যে রাখা। নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া কোন চাওয়াকেই বাস্তবায়ন করা যায় না। নিম্নে কিছু করণীয় উল্লেখ করা হলো-

১- সিজদার সময় একান্তে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চান। রাসূল (ছাঃ) এ ধরনের পেরেশানীর অবস্থায় এ দো'আ পড়তেন يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك **বা** يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 'হে অন্তরের পরিবর্তনকর্তা! আমাদের অন্তরকে তুমি তোমার আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯)*।

২- সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করুন *(মু'মিন-৫৫)*। সকাল-সন্ধ্যায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করুন *(রা'দ-২৮)*। রাত-দিনের মাসনূন দোআ'গুলো মনে করে পড়ুন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার জিহ্বা যেন সবসময় আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে *(মিশকাত হা/২২৭৯)*।

৩- আল্লাহর মাহাত্ম্য ও বড়ত্বকে স্মরণ করুন। আল্লাহর দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নিদর্শনাবলীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন *(বাক্বারা-১৬৪)*। দিনে দশ সেকেন্ডের জন্য হলেও আল্লাহর স্মরণে চোখ বন্ধ করে উর্ধ্বলোকে বিচরণ করুন।

৪- ছাহাবা ও সালাফে সালেহীনের জীবনেতিহাস পাঠ করুন। তাদের আল্লাহর রাস্তায় অটল থাকার হিম্মত ও মহিমাকে অন্তরে গেঁথে নিন।

৫- ছালাতকে তার পরিপূর্ণ হক্ব সহকারে আদায় করুন, ঠিক যেভাবে রাসূল (ছাঃ) দেখিয়ে দিয়েছেন। ছালাতের মাঝে যে অনন্যসাধারণ পবিত্রতা, ইতিবাচক প্রভাব এবং হৃদয়ের প্রশান্তি রয়েছে তা কেবল যথার্থভাবে আদায়কারীই অনুভব করতে পারেন।

৬- ছাদাকা করুন বিশেষতঃ গোপনে *(বাক্বারাহ ২৭১)*। মনের উপর এর যে বিরাট প্রভাব রয়েছে তা কেবলমাত্র দাতাই অনুভব করতে পারেন।

৭. সমাজকল্যাণমূলক কাজে মনোনিবেশ করুন। মানুষকে বিপদ-আপদে সহযোগিতা করুন। সৎকাজের জন্য উৎসাহিত করুন। অসৎকাজ দেখলে সাধ্যমত নিষেধ করুন। উত্তম বন্ধুদের সাহচর্যে থাকুন। সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ ফিরে আসলে আপনি নিজেকে অন্যরূপে আবিষ্কার করবেন।

৮. সর্বোপরি পরকালীন চিন্তাকে সবসময় অগ্রাধিকার দিন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার সব চিন্তাকে আখেরাতমুখী করবে, আল্লাহ তার দুনিয়াবী চিন্তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াবী চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকবে, সে কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল সে ব্যাপারে আল্লাহ কোন যিম্মাদারী নিবেন না' *(ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২৬৩)*।

এভাবে নিজেকে জাগ্রত রাখতে পারলে আপনার মানসিক অস্থিরতা দূর হবে এবং সৎ আমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ *(শূরা ২৩)*। আল্লাহর বান্দা হিসাবে নিজেকে মর্যাদা দিন *(বনী ইসরাঈল-৭০)*। এতে অন্তরে অপার্থিব এক পবিত্রতা, এক সুস্থির প্রশান্তি অনুভব করবেন যা আপনাকে ন্যায় ও কল্যাণের উপর দৃঢ় রাখবে *(নূর ৩৫)*। সাথে সাথে পাপকাজগুলো একে একে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করুন। সৎ আমল বেশী বেশী করার মাধ্যমে পাপ কাজের মানসিকতা দুরীভূত হয়ে যায় *(হূদ ১১৪)*। অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন বিনোদনে সময় নষ্ট করা থেকে সতর্কতার সাথে নিজেকে বিরত রাখুন। নতুবা শয়তানের প্ররোচনায় আপনার আমল ধীরে ধীরে শিথিল হতে থাকবে *(নূর ২১)*। আল্লাহ আমাদেরকে তার দ্বীনের উপর অটল রাখুন এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে হেফাজত করুন। আমীন!

???? সংগঠন কি? একজন সংগঠকের বৈশিষ্ট্য ও কর্তব্য কি?

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী

সংগঠন শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ হলো الجماعة যা তিনের অধিক একত্রিত বা সমন্বিত কিছুকে বুঝায়। অর্থাৎ সমন্বিতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে কোন কার্যক্রম পরিচালনার নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই হলো সংগঠন। মানুষ স্বভাবতঃই একাকী জীবনযাপন করতে পারে না। সামাজিক বা সামষ্টিক জীবন যাপনই তার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর মাঝে এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন। সংগঠন হলো এই সমষ্টির একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো। একটি পরিবার যদি হয় ক্ষুদ্র সংগঠন তবে রাষ্ট্র হলো তার সর্ববৃহৎ রূপ। সীমিত অর্থে তাই প্রতিটি মানুষই এক একজন সংগঠক। কোন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় নীতিমালার আলোকে সামষ্টিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করাই একটি সংগঠনের কাজ। সংগঠক হলো এই সংগঠনের মূল প্রাণ যার কর্তব্য হলো সংগঠনকে সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করা।

সংগঠকের ভূমিকার উপরই নির্ভর করে একটি সংগঠনের গতি-প্রকৃতি। তার পরিচালনা নীতিই নির্ধারণ করে দেয় সংগঠনের গন্তব্যপথ। তাই সংগঠনে সংগঠকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একজন সংগঠকের সাধারণ কিছু কর্তব্য হলো-

১. সংগঠনের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা। লক্ষ্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে অথবা লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে সংগঠক সংগঠনের জন্য কাংখিত ফলাফল আনতে নিশ্চিত ব্যর্থ হবে।

২. লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অটল মানসিকতা পোষণ করা। জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি বিষয় জরুরী হলেও একটি সুস্থ ইতিবাচক মানসিকতাই একজন সংগঠকের প্রধান সম্পদ যে মানসিকতার বদৌলতে সে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে ধৈর্য ও সাহসের সাথে মোকাবিলা করে জনসমষ্টিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে অবিচল থাকে। স্বার্থের টান, বিপদের হুমকি, অপ্রাপ্তির হতাশা তাকে কুণ্ঠিত করে না। ব্যর্থতার গ্লানিকে অতিক্রম করে সম্ভবনার দুয়ার অনুসন্ধানের দৃঢ়চিত্ততা তাকে একমুহূর্তের জন্যও লক্ষ্য অর্জনে পিছপা করে না।

৩. নিয়ন্ত্রণাধীন বলয়কে একটি পরিবার, একটি টীম বা একটি রাষ্ট্রের মত মনে করা; যার প্রতিটি অঙ্গকে সংগঠক সমানভাবে একই লক্ষ্যে পরিচালিত করে। একজন অনুঘটক, একজন প্রণোদনাদাতা হিসাবে প্রত্যেকের মাঝে সে কর্তব্যের চরম তৃষ্ণাবোধ জাগিয়ে দেয়। কাংখিত লক্ষ্যে উজ্জীবিত করে সে লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যেকের মাঝ থেকে সর্বোচ্চটুকু বের করে আনার প্রয়াস চালায়। সংগঠক একদিকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়; অপরদিকে পিছনে থেকে নিয়ন্ত্রণের লাগাম সচেতনতা, দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে ধারণ করে থাকে।

৪. নির্ভরতার প্রতীক হিসাবে মমতাপূর্ণ সহনশীলতা, উদারতা, সহানুভূতি অবলম্বন করা। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বিশৃংখল জনগোষ্ঠীকে একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা তার কর্মনীতির মূল বৈশিষ্ট্য।

৫. নিজের প্রতি, সমাজের প্রতি চেতনাপূর্ণ দায়িত্বশীলতা থাকা। দায়িত্বপরতার কঠিন সংগ্রামে সে আপন বলয়কে এমন এক বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে যাকে ইচ্ছা করলেই এড়ানো যায় না। সনিষ্ঠ দায়িত্ববোধ, নির্ভুল কর্তব্যপরায়ণতা তাকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতি মুহূর্তে তৎপর রাখে।

মোটকথা সার্বক্ষণিক লক্ষ্যে অবিচল থাকা এবং ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রেখে অভিষ্ট লক্ষ্যে জনগোষ্ঠীকে সম্মুখপানে অগ্রসর রাখার প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গন্তব্যে পৌছাতে আপ্রাণ চেষ্টা করাই একজন প্রকৃত সংগঠকের মূল বৈশিষ্ট্য।

উত্তম চরিত্রগুণ, সার্বজনীন ভালবাসাবোধ, সদাচরণ, অকপট সারল্য, কর্তব্যনিষ্ঠা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, সৎসাহস, নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এবং অপরের অধিকার প্রদানে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি মহৎগুণগুলো একজন সংগঠককে মানবসমাজে বিশেষভাবে স্থান করে দেয়।

গাজায় মানবিক বিপর্যয় চরমে

১৯৪৮ সালে ইসরাইলের দখলদারিত্ব শুরু হওয়ার পর ২০০৮-০৯ সালে ফিলিস্তিনের বুকে সবচেয়ে বেশী রক্তক্ষয় হয়েছে। ২০০৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর গাজায় বর্বর ইসরাইলী হামলা শুরুর পর মোট ১৪১৭ জন ফিলিস্তিনী নিহত হয় যাদের মধ্যে ৩১৩ জন শিশু ও ১১৬ জন নারীসহ ১১৮১ জনই বেসামরিক। গুরুতর আহত হয় ১১৩৩ শিশু ও ৭৩৫ জন নারীসহ মোট ৪৩৩৬ জন যাদের অনেকেই স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে গেছে। ২০০৯ সালে শুরুতে ১৭ জানুয়ারী যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত নিহত হয়েছে আরো ৪০৯ জন। আহত হয়েছে ৭৪১। এক মাসে ২৭টি মসজিদ, ৭২টি কিন্ডার গার্টেন, ৬৭টি স্কুল, ২১৯টি শিল্প-কারখানা, ১৫টি হাসপাতাল ও ৪১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া মসজিদ, বাড়ীঘর, স্থাপত্য, কৃষিভূমির সংখ্যা গণনারও অতীত। জাতিসংঘের হিসাবমতে তা অনধিক ১৫ হাজার। বাস্তুচ্যুত হয়েছে ৬০ হাজার মানুষ। সেপ্টেম্বর'২০০০ ইন্তিফাযা শুরু হওয়ার পর ২০০৮ সালের শেষ পর্যন্ত ইসরাইলীদের হাতে নিহতের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫২৮৭ জন। আহত হয়েছে হাজার হাজার। যাদের মধ্যে স্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করেছে শত শত মানুষ। বর্তমানে গাজার ৮০ ভাগেরও বেশী অধিবাসী অন্ন-বস্ত্রের জন্য ত্রাণ সংস্থাগুলোর উপর নির্ভরশীল। ইসরাঈলের সিমান্ত অবরোধের কারণে চরম খাদ্য, জ্বালানী সংকটে তারা বাধ্য হয়ে গাজা থেকে মিসর সিমান্ত পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার ব্যাপী অঞ্চলে অসংখ্য টানেল বা সুড়ঙ্গপথ তৈরী করে গোপনে তারা মিসর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে। গাজার বর্তমান অর্থনীতির ৬০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে এসব গোপন সুড়ঙ্গ। সম্প্রতি আমেরিকার চাপে মিসর সরকার সুড়ঙ্গগুলো বন্ধের জন্য সাঁড়াশী অভিযান শুরু করেছে।

চেক প্রজাতন্ত্রে ইসলামের অগ্রযাত্রা

খুব বেশী দিন নয় যখন ইউরোপের দেশ চেক প্রজাতন্ত্র ও ইসলাম ছিল দুই মেরুর বাসিন্দা। এ দুইয়ের একত্রবাস ছিল তখন একবারে অচিন্তনীয়। দুই দশক পূর্বে চেকোস্লোভাকিয়ায় কম্যুনিস্ট শাসনের অবসানের পর এ অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ২০০৪ সালের দেশটিতে ইসলাম ধর্ম সরকারী স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে নবমুসলিমের সংখ্যা। গড়ে উঠছে নতুন মসজিদ ও দা'ওয়াতী সংগঠন। রাজধানী প্রাগের প্রধান মসজিদের পরিচালক ভ্লদিমির উমর সানকা বলেন, পাঁচশত মুসুল্লীর সংকুলান হওয়া এ মসজিদে প্রতি শুক্রবার এত বেশী ভীড় হয় যে, আমাদেরকে প্রায়ই দুটি জামা'আত ও দুটি খুৎবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। গতবছর ঈদুল আযহার জামাতে পনেরশ'র অধিক মুসুল্লীর জন্য একটি ক্রীড়াঘর ভাড়া করতে হয়েছিলো। প্রতি সপ্তাহে গড়ে একজন এ সেন্টারে এসে মুসলমান হচ্ছে। ২০০৭ সালের হিসাবে এদেশে মুসলমানের সংখ্যা ১২,০০০। তবে বর্তমানে এ সংখ্যা ২০,০০০ এরও বেশী। গত বছরের জুনে ২১ বছর বয়স্কা নবমুসলিম তরুণী জিটকা কারভিনকোভা 'মুসলিম অফ চেক রিপাবলিক' নামক ফেসবুক গ্রুপ খুলেছেন যার সদস্য সংখ্যা বর্তমানে প্রায় সাতশত। গ্রুপ স্বেচ্ছাসেবকগণ ইসলাম সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মকে নানাভাবে সহযোগিতা করছেন। ১৯৯১ সালে সর্বপ্রথম ইসলামী সংগঠন 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' গঠিত হয়। ১৯৯৮ সালে তাদের উদ্যোগে বার্নো শহরে প্রথম মসজিদ নির্মিত হওয়ার একবছর পর প্রাগের এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। এ দু'টি মসজিদই বর্তমানে চেক মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছে। অন্যান্য শহরগুলোতেও মসজিদ নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তবে প্রায়ই স্থানীয় অধিবাসী ও চার্চের বিরোধিতার শিকার হতে হচ্ছে।

আয়ারল্যান্ডে উচ্চ মাধ্যমিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

সৌদি সরকার আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে একটি বড় আকারের মাদরাসা স্থাপন করতে যাচ্ছে। আয়ারল্যান্ডে বসবাসরত প্রায় ৪০ হাজার মুসলিম অধিবাসী এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। ইতিপূর্বে সে দেশে কয়েকটি নিম্ন মাধ্যমিক ইসলামিক স্কুল থাকলেও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল এটাই প্রথম। উল্লেখ্য, সৌদি আরব দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, দা'ওয়াহ সেন্টার, ইসলামী স্কুল প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে।

ইসরাঈলে ইহুদী তরুণীর ইসলাম গ্রহণ

১৭ ডিসেম্বর স্পেনের 'লা মন্ডে' পত্রিকা ১৯ বছর বয়সী ইসরাঈলের কারমাইল শহরের এক ইহুদী তরুণীর ইসলাম গ্রহণের খবর ফলাও করে ছেপেছে। মারো নামক এই নবমুসলিম তরুণী 'লা মন্ডে'কে জানান, 'আমি ইহুদী হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছি, আমার পূর্বপুরুষগণ হলোকষ্টে প্রাণ দিয়েছে অথচ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এ কারণে অনেকেই আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেছে এবং আমি যা করেছি তাকে পাগলামী বলেছে। তবে আমি নিশ্চিত করছি যে, আমি সজ্ঞানে ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করেছি এবং আমার পূর্বপুরুষদের কৃতকর্মকে মন থেকে মুছে ফেলেছি'। ডানপন্থী কট্টর ইহুদীবাদী পিতার সন্তান এই তরুণী ইতিমধ্যে ইসলামী শরী'আতের নীতিমালা পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। হিজাব পরা ছাড়াও নিয়মিত কুরআন পাঠ শিক্ষা করছেন। তিনি বলেন, 'আমি ১৩ বছর বয়সেই পবিত্র কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হই। সেখানে আমি আমার বহু প্রশ্নে জওয়াব পেয়েছিলাম যা আমার ধর্মে পাইনি। প্রথমবার যেদিন আমি মসজিদের নিকটবর্তী হই তখন আমি অন্তরে এক অনন্য অসাধারণ পবিত্র অনুভূতির স্পর্শ পাই। এক অনির্বচনীয় নির্ভারতা ও প্রশান্তি আমাকে গ্রাস করে'। ইসলাম গ্রহণের পর স্বীয় পিতা-মাতার হতাশা ও বিশ্বাসঘাতক হিসাবে তার প্রতি দৃষ্টিপাতকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতদস্বত্বেও আমি তাদের সাথে থাকতেই পছন্দ করব যাতে তারা আমার এই নতুন জীবনকে এবং আমার গৃহীত ধর্মকে অনুধাবন করতে পারেন। উল্লেখ্য, ব্যাপক কড়কড়ি স্বত্বেও প্রতিবছর ইসরাঈলে ইসলাম গ্রহণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'মা'আরীফ' পত্রিকার ভাষ্যমতে, প্রতিবছরই শতাধিক ইহুদী তাদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছে। সর্বশেষ পাঁচ বছরে বৃদ্ধির হার বেড়েছে কয়েকগুণ।

রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে নির্মিত হচ্ছে সর্বোচ্চ মিনার

সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডে মসজিদের মিনার নির্মাণ নিয়ে যখন তুমুল বিতর্ক চলছে ঠিক তখন রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর নির্মাণাধীন কেন্দ্রীয় মসজিদের সাথে নির্মিত হচ্ছে ৭৫ উচু মিনার যা বিখ্যাত ক্রেমলিন প্রাসাদ থেকেও দেখা যাবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ সম্প্রতি মস্কোর একটি প্রাচীন মসজিদ পরিদর্শন করেন এবং জুতা খুলে সেখানে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি রুশ ফাৎওয়া কাউন্সিলের প্রধান জনাব রাফায়েল যায়নুদ্দীনের সাথে সাক্ষাত করেন। তার এই সফরের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মসজিদ নির্মাণের জন্য বিধি-নিষেধ শিথিল করে এবং ক্রেমলিন প্রাসাদের মাত্র তিন মাইল দুরে কেন্দ্রীয় মসজিদ স্থাপনের অনুমতি দেয়। মসজিদটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে রুশ ফাৎওয়া কাউন্সিলের প্রধান অফিস এখানেই স্থানান্তরিত হবে। এর অভ্যান্তরভাগে পাঁচহাজার এবং উন্মুক্ত অংশে আরো বিশ হাজার মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারবে। তুর্কী সরকারের ২০০ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তায় ২০১২ সালের মধ্যেই এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে বলে মসজিদ কর্তৃপক্ষ আশা করছেন।

উল্লেখ্য, মস্কোতে দুই মিলিয়নের অধিক মুসলিম বসবাস করলেও মসজিদ রয়েছে মাত্র ৬টি। এজন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সেখানে আরো দশটি মসজিদ নির্মাণের জন্য সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সমগ্র রাশিয়ায় বর্তমান মুসলিম জনসংখ্যা ২০ মিলিয়নেরও বেশী যেখানে মসজিদের সংখ্যা ৫ হাজারের অধিক। অন্যদিকে মুসলমানদের উপর সরকারী নির্যাতন আগের মতই অব্যাহত রয়েছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ভাষ্যমতে, বর্তমানে সে দেশে সরকারকর্তৃক আটক বন্দীদের তিনভাগের একভাগই মুসলমান। যাদের অধিকাংশই চরমপন্থা অবলম্বনসহ দ্বীনী ও রাজনৈতিক বিষয়ে আপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশের অভিযোগে আটক রয়েছে।

বিষাদের নিরালায়

গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুর। ট্রেনের জানালা দিয়ে আসা প্রকৃতির অগ্নি শ্বাস-প্রশ্বাসের টানা ঝাপটায় চেহারাটা হয়ে গেছে শুষ্ক মরুভূমির মত। দূরের সারি সারি কড়ুইয়ের সবুজ সজীবতা আর পাকা ধানের স্বর্ণালী ঢেউ মাঝে মাঝে শীতল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে দৃষ্টির পরে। ছোট জানালা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে একেকটি দৃশ্যপট প্রতি মুহূর্তে কালের গতিতে... আগামীর প্রতি সশ্রদ্ধায় আত্মনিবেদন করে.. দৃষ্টির বিভ্রমে কখনো দ্রুত কখনো বা ধীরে। ছন্দময় ঝিক ঝিক শব্দে নিমগ্নতায় পেয়ে বসা মনের গহীনে গচ্ছিত হাযারো স্মৃতি উঁকি দিচ্ছে। চোখের তারায় ভেসে বেড়াচ্ছে অধরা কোন স্বপ্ন। কোন এক সুদূরে মনটা বিধে রইল কে জানে... তখনো ট্রেন প্লাটফর্মে স্থির হয় নি। সম্বিত ফিরলো জানালার বাইরে থেকে হাত বাড়ানো ময়লা, জীর্ণ বস্ত্র পরিহিতা নারীর ভিখ্ মাগায়। কোলে মুদ্রিত চোখে এলিয়ে থাকা রুগ্নদর্শন শিশু। একদন্ড দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পকেট হাতড়ে নির্বিকার ভাবে দু'টাকা বাড়িয়ে দেই। ভীখারীনী পরের জানালায় এগিয়ে যায় ব্যস্তভাবে। সবার আগে আগে প্রথম ভিক্ষাটা সংগ্রহে সে খুব সচেতন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় ওর নিশ্চয়ই জানা ভিক্ষাদাতার মনস্তত্ব। খানিক বাদে ট্রেন আবার নড়ে উঠল পরবর্তী গন্তব্যের পথে। অবলা নারী ক্ষণিকের বিশ্রাম পায় পরবর্তী ট্রেন আসার পূর্ব পর্যন্ত। নিত্য পরিচিত এ দৃশ্যটি আজ কেন যেন অস্বস্তিকর ঠেকল। আবার তাকালাম নারী ও শিশুটির যাত্রাপথের দিকে। কে এই নারী.. কার এ সন্তান.. কেন সে রাস্তায়..কেমন এদের জীবন.. কোলের সন্তানটিও কি বড় হয়ে ওর মায়ের মতই রাস্তায় ঘুরে ফিরবে.. স্রষ্টা কি ওদের এজন্যই সৃষ্টি করেছেন.. এভাবেই কি ওদের জীবন একদিন শেষ হয়ে যাবে..! দীর্ঘ তন্ময়তা ভঙ্গ হয় পরের স্টেশনে এসে ট্রেন থামায়। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরে এলো প্লাটফর্মের এ মাথা থেকে ও মাথা। হরেক কিসিমের মানুষের মাঝে উত্তপ্ত গরমে দেয়াল ঘেষে তন্দ্রাচ্ছন্ন কিংবা শূণ্য বোবা দৃষ্টিতে শুয়ে থাকা অপুষ্ট, নোংরা পোষাক পরিহিত মানুষগুলো দৃষ্টি এড়ায় না। কারো চুল পীতাভ লম্বা জটাধরা। শরীর বহুদিন পানির পরশ থেকে বিচ্ছিন্ন। কেউ বা পান চিবুচ্ছে একমনে। সিগারেটের কাপা কাপা ধোঁয়ায় নেশাচ্ছন্ন হচ্ছে কেউ। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকি ওদের লক্ষ্যহীন, গন্তব্যহীন, পশুবৎ জীবনযাত্রার দিকে। গলা শুকিয়ে আসে। ঘাড় ব্যাথায় টনটন করে। কিন্তু দৃষ্টি ফেরাতে পারি না। বিষাদের মেঘে মনটা খুব ভারী হয়ে আসে। এক সময় নীল আকাশের স্রষ্টার দিকে অভিযোগের নেত্র নিবদ্ধ হয়। হায় মালিক! ওরা কি তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টজীব নয়? এ দশা কেন ওদের? কি অপরাধ ওদের? নাকি শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার এই আমাদের মত পাপীষ্ঠদের জন্য পরীক্ষার নির্মম গিনিপিগ হিসাবে রেখেছ ওদের?..অশ্রুর কুয়াশায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে..। ভেবে যাই, এদের জন্য কি সরকার, প্রশাসন বা স্থানীয়দের কিছুই করার নেই? জাতীয়-আন্তর্জাতিক হাযারো সংস্থা যারা হররোজ দারিদ্র বিমোচন সেমিনার আর প্রশিক্ষণে কোটি কোটি টাকা ঢালছে তাদের কি নজর কোনদিন পড়েনা রেল লাইনের এ মানুষগুলোর প্রতি? দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলেম-ওলামা ও দ্বীনী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যাদের দায়িত্ব ছিল সামাজিক নেতৃত্ব প্রদান করা, তারা কি সমাজের অতি নিম্নস্তরের এই মানুষগুলোর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন না? দ্বীন কি শুধু উচু-মধ্য তলার মানুষগুলোরই অলংকার.. এতে কি নীচতলার এই নোংরা অস্পৃশ্যগুলোর কোন অধিকার নেই.. এদের কি জান্নাত, জাহান্নাম নেই..। ভাবতে ভাবতে ট্রেন আবার নড়ে উঠেছে গন্তব্যপানে। সহসাই চমকে উঠি.. ওদের জন্য কি আমারও করণীয় আছে কিছু? মনের ভিতর যেন ছোটখাট ঝড় বয়ে যায়। দূর্বল আত্মা এক লম্বা, ভারী দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আটকে পড়ে সংশয়ের খাঁদে। অক্ষমতার এক দূর্বহ ভার চেপে বসে চিন্তার অলি-গলিতে। মধ্যবিত্তের পিছুটান মানসিকতা সাঁজ সাঁজ রব নিয়ে হাজির হয় মুহূর্তেই। বাস্তববাদী হবার তাগাদা দেয়। তাচ্ছিল্যের সাথে এক ঝটকায় দূরে ঠেলে দেয় নিরর্থক কষ্টকল্পনাকে। খামছে নিবৃত করে দেয় আমার অসার কর্তব্যবোধকে। উপদেশ দিয়ে বলে চলে, ওরা চলুক ওদের পথে.. ওদের দেখার প্রয়োজন নেই.. নিজেকে সামলাও.. ওদের রূযির মালিক, হেদায়েতের মালিক আল্লাহ.. তোমাকে ভাবতে হবে কেন ওদের জন্য।.. মুমিনদের উদ্দেশ্যে কাফিরদের কথাটি মনে পড়ে যায় এ সময় 'আমরা কি তাকে খাদ্য দান করব যাকে আল্লাহ চাইলেই খাওয়াতে পারেন? তোমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ডুবে আছ *(ইয়াসীন ৪৭)*। তবুও ভাবান্তর আসে না.. মনে হয় কথাটা যেন ঠিকই..। পথের ধুলোদের জন্যই তাহলে ওদের সৃষ্টি.. আমার দয়াদ্র চিত্ততা, ঔদার্য, শোকরগোজারী, দানশীলতা আর হাযার রকম অনুগ্রহ পরীক্ষার জন্যই হয়ত স্রষ্টা ওদের এই অবয়ব দিয়েছেন..। শেষ বেলায় প্রবোধটা মেনে নিতে দেরী হয় বেশ। সেই ফাঁকে হঠাৎই কেন যেন ভাবতে ইচ্ছা করে- এই অস্পৃশ্যগুলোকে আলোর পথ দেখাতে স্রষ্টা কেবল আমাকেই দায়িত্ব দিয়েছেন। এ দায়িত্ব আমাকে নিতেই হবে। মনটা আনচান করে উঠে ওদের জন্য।

-তানভীর হাসান লাবীব

কলেজ রোড, প্রফেসরপাড়া, মাগুরা।

একদা মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে

বেলা দশটা বেজে গেছে। জরুরী কাজের তাড়া। পানি পান করে গ্লাস থেকে বাকি টুকু ফেলে দিতে জানালার কাছাকাছি হলাম। বাইরে স্তুপ করে রাখা নতুন ধানের আঁটি। পাশেই মাড়াইযন্ত্রে ধান মাড়াই করছে শ্রমজীবী দুই মহিলা ও একজন পুরুষ। তীব্র রোদে ওদের চেহারা তামাটেবরণ। দ্রুত পানি ফেলে দিয়ে দৃষ্টি ঘুরাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখ আটকে গেল দৌড়ে আসা ৫-৬ বছরের গোলগাল মায়াবী চেহারার এক ছোট ছেলের দিকে। ঠিক আমার জানালার নিচে ছায়ায় রক্ষিত কাপড়ের থলে ও ঢেকে রাখা পাত্রের পাশে বিচালী গাদার উপর বসে পড়ল সে। কাজে নিমগ্ন সম্ভবত ওর মা-ই এগিয়ে এল। বুঝলাম সকালের নাস্তার খোঁজেই দুরন্ত ছেলেটির হঠাৎ আগমন। বেলা গড়িয়ে গেছে কখন। খেলাধুলার মাঝে বাচ্চাটি ক্ষিধে ভুলে গিয়েছিল হয়ত। ঘর্মাক্ত মহিলাটি মমতা জড়ানো ভঙ্গিতে ছেলেকে খাবার দেখিয়ে দিয়ে আবার কাজে চলে গেল। নড়তে যেয়েও পারলাম না। মায়া পড়ে গেছে বাচ্চাটির উপর। মনে হল একটু দেখে যাই বাচ্চাটির খাওয়ার দৃশ্যটি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছি ওর প্রতিটি নড়াচড়া। থালার পাশে জগটি টেনে নিয়ে মুখ খুলে দেখল। আমিও তাকালাম। তেলের পাতলা আস্তরণ দেখে মনে হল আধাপূর্ণ জগটিতে ডাল রাখা। দূর থেকেও পানিসদৃশ ডাল ভেদ করে জগটির তলা পর্যন্ত দিব্যি দেখা যাচ্ছে। বাচ্চাটির চেহারায় খুশির ঝিলিক। দূর থেকে মাকে ডেকে জানতে চায় কোথায় পেল ডাল নামক এ মহাসম্পদটি। বিজয়ের হাসিতে মা জানায় সে পেয়েছে কোন এক বাড়ির দয়ালু মহিলার কাছে। পরম আগ্রহে ছেলেটি থালার মুখ খোলে। অর্ধ প্লেট পানতা। এক কোনে এক দলা লবন। খাওয়ার জন্য হাত ধুয়ে প্রস্তুতি নেয় সে। বিস্তীর্ণ সদ্য ধান কাটা মাঠের মৃদু বাতাসে মা ও ছেলের স্বর্গসুখের এই অন্তরঙ্গ মুহূর্ত নিবিড়ভাবে দেখতে পেরে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হল। সব ভুলে দেখতেই থাকি ওর সারাদিনের এই শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটা। কিভাবে যেন ছেলেটির দৃষ্টি পড়ে গেল আমার উপর। সুযোগ পেয়ে এক ঝলক মুচকি হাসি ছুড়ে দিলাম। বাচ্চাটি আমাকে দেখে যেন হতভম্ব হয়ে গেল। খাওয়া ছেড়ে লজ্জায় আড়ষ্ঠ হাসি ঠোটে লাগিয়ে বিচালির একটা কাঠি খুটতে লাগল। যেন আমাকে সামনে রেখে সে একাকী খেতে চায় না। বিস্মিত হলাম। খুব আদরের কণ্ঠে বললাম, বাবু খাও। ও আরো হাসে আর কাঠি খোটে, কোন কথা বলে না, খাচ্ছেও না। এদিকে আমারও দেরী হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ওর সৌজন্যবোধকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুষ্ক একটা স্নেহের হাসি দিয়ে জানালা থেকে সরে আসলাম। দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম গন্তব্যপানে। মন পড়ে রইলো বাচ্চাটির পরম পরিতৃপ্তিমুখর খাওয়ার দৃশ্যে।

-ফারহান শামস্

বালিয়াপুকুর, রাজশাহী।

কবিতা

নি শা ন - ব র দা র

-ফররুখ আহমদ

চারিদিকে কারা ফেলে বিষাক্ত শ্বাস
কারা ব'য়ে আনে করোটিতে মৃতাসব,
শবের মিছিলে ভিড় ক'রে আসে শব;
মুখে বয়ে আনে চরম সর্বনাশ।

সে পাশবতার আজ উদ্যত ফণা
বিষাক্ত করে সুদূর সম্ভাবনা,
ভেঙে পড়ে তার পুচ্ছ আঘাতে স্বপ্নের চারাগাছ,
লাত মানাতের সঙ্গে নাচে পিশাচ
আধো জীবন্ত তনু;
রং চটা তার আকাশে কখন নিভেছে বর্ণ ধনু।

সে সিদরাতুল-মুন্‌তাহার
পথ ভোলা বুলবুলি,
প্রতি মুহূর্তে আবিল করে সে
এই ধরণীর ধূলি,
ম্লান জুলমাতে আজ সে বিবর গড়ি'
দীপ্ত দিনেরে করেছে কখন বিস্বাদ শর্বরী।
তার কণ্ঠের বীভৎস চীৎকারে-
কেঁপে ওঠে বারে বারে
ঊষর মাটির বক্ষে অনুর্বর
দুঃস্বপ্নের ঘর।

শঙ্কিত তার দিনের আকাশ,
বিভীষিকা ভরা ঘুম,
ছিন্ন ডেরার দুয়ারে আঘাত
হানে মরু সাইমুম,
তার কলিজায় রক্তে রঙিন গ'ড়ে ওঠে ইমারত,
তার কঙ্কাল বিছায়ে জালিম মাপে মিনারের পথ;
পথে পথে আজ শোন তার হাহাকার
হে নিশান বরদার!

এখানে তোমার নিশান ওড়াও, নিশান ওড়াও বীর,
এখানে শুধুই আবছায়া রাত্রির
তিমির নিবিড়তর,
এখানে তোমার সূর্য প্রকাশ করো
জনারণ্যের শাখায় শাখায় জাগে প্রাণ-ব্যাকুলতা
আনো আনো তার বিপুল তৃষার দুকূলে উচ্ছলতা
সমুদ্র স্রোতোধার;
হে নিশান বরদার ॥

('সাতসাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের নিশান বরদার কবিতার অংশবিশেষ)

সাধারণ জ্ঞান

মুসলিম শাসকবর্গের তালিকা

খুলাফায়ে রাশেদা (৬৩২-৬৬১খৃঃ= ৩০ বছর)

	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	আবু বকর বিন আবী কুহাফাহ (রাঃ)	১১-১৩	৬৩২-৬৩৪
২	উমার বিনুল খাত্তাব (রাঃ)	১৩-২৩	৬৩৪-৬৪৪
৩	উছমান বিন আফ্ফান (রাঃ)	২৩-৩৫	৬৪৪-৬৫৬
৪	আলী বিন আবী তালেব (রাঃ)	৩৫-৪০	৬৫৬-৬৬১

উমাইয়া শাসনামল (৬৬১-৭৫০ খৃঃ= ৯০ বছর)

	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	মু'আবিয়া বিন আবী সুফিয়ান (রাঃ)	৪০/৪১-৬০	৬৬১-৬৮০
২	ইয়াযিদ বিন মু'আবিয়া	৬০-৬৪	৬৮০-৬৮৩
৩	মু'আবিয়া বিন ইয়াযিদ	৬৪	৬৮৩-৬৮৪
৪	মারওয়ান বিন হাকাম	৬৪	৬৮৪-৬৮৫
৫	আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান *হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (ইরাকসহ পূর্বাঞ্চলীয় গভর্নর)	৬৫-৮৬ ৭৬-৯৬	৬৮৫-৭০৫ ৬৯৪-৭১৪
৬	আল ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক	৮৬-৯৬	৭০৫-৭১৫
৭	সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক	৯৬-৯৯	৭১৫-৭১৭
৮	উমর বিন আব্দুল আজীজ	৯৯-১০১	৭১৭-৭২০
৯	ইয়াযিদ বিন আব্দুল মালিক	১০১-১০৫	৭২০-৭২৪
১০	হিশাম বিন আব্দুল মালিক	১০৫-১২৫	৭২৪-৭৪৩
১১	আল ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ	১২৫-১২৬	৭৪৩-৭৪৪
১২	ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ (১ম)	১২৬	৭৪৪
১৩	ইবরাহীম বিন ওয়ালিদ (১ম)	১২৬-১২৭	৭৪৪
১৪	মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ	১২৭-১৩২	৭৪৪-৭৫০

আব্বাসীয় শাসনামল (৭৫০-১২৫৮ খৃঃ= ৫০৯ বছর)

	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	আবুল আব্বাস আস সাফ্ফাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ	১৩২-১৩৬	৭৫০-৭৫৪
২	আবু জা'ফর আল মানসুর বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ	১৩৬-১৫৭/১৫৮	৭৫৪-৭৭৫
৩	আল মাহদী বিন আল মানসূর	১৫৮-১৬৯	৭৭৫-৭৮৫
৪	আল হাদী বিন আল মাহদী	১৬৯-১৭০	৭৮৫-৭৮৬
৫	হারুনুর রশীদ বিন আল-মাহদী	১৭০-১৯৩	৭৮৬-৮০৯
৬	আল আমীন বিন হারুনুর রশীদ	১৯৩-১৯৮	৮০৯-৮১৩
৭	আল মা'মূন আবু জা'ফর বিন হারুনুর রশীদ	১৯৮-২১৮	৮১৩-৮৩৩
৮	মু'তাসিম বিল্লাহ বিন হারুনুর রশীদ	২১৮-২২৭	৮৩৩-৮৪২
৯	আল ওয়াসিক বিন মু'তাসিম বিল্লাহ	২২৭-২৩২	৮৪২-৮৪৭
১০	আল মুতাওয়াক্কিল বিন মু'তাসিম	২৩২-২৪৭	৮৪৭-৮৬১
১১	আল মুসতানসির বিন আল মুতাওয়াক্কিল	২৪৭-২৪৮	৮৬১-৮৬২
১২	আল মুসতাঈন বিন আল মুতাওয়াক্কিল	২৪৮-২৫২	৮৬২-৮৬৬
১৩	আল মু'তায বিন আল মুতাওয়াক্কিল	২৫২-২৫৫	৮৬৬-৮৬৯
১৪	আল মুহতাদী বিন ওয়াসিক	২৫৫-২৫৬	৮৬৯-৮৭০
১৫	আল মু'তামাদ মুওয়াফ্ফাক বিন আল মুতাওয়াক্কিল	২৫৬-২৭৯	৮৭০-৮৯২
১৬	আল মু'তাযিদ বিন আল মুতাওয়াক্কিল	২৭৯-২৮৯	৮৯২-৯০২
১৭	আল মুকতাফী বিন আল মু'তাজিদ	২৮৯-২৯৫	৯০২-৯০৭/৯০৮
১৮	আল মুকতাদির বিন আল মু'তাজিদ	২৯৫-৩২০	৯০৭/৯০৮-৯৩২
১৯	আল কাহির বিন আল মু'তাজিদ	৩২০-৩২২	৯৩২-৯৩৪
২০	আল রাজী' বিন আল মুকতাদির	৩২২-৩২৯	৯৩৪-৯৪০
২১	আল মুত্তাকী বিন আল মুকতাদির	৩২৯-৩৩৩	৯৪০-৯৪৪
২২	আল মুসতাকফী বিন আল মুকতাফী	৩৩৩-৩৩৪	৯৪৪-৯৪৬
২৩	আল মুতী' বিন আল মুকতাদির	৩৩৪-৩৬৩	৯৪৬-৯৭৪
২৪	আত তাই বিন আল মুতী'	৩৬৩-৩৮১	৯৭৪-৯৯১
২৫	আল কাদির বিন আল মুত্তাকী	৩৮১-৪২২	৯৯১-১০৩১
২৬	আল কাইম বিন আব্দুল কাদীর	৪২২-৪৬৭	১০৩১-১০৭৫
২৭	আল মুকতাদি বিন আল কাদির	৪৬৭-৪৮৭	১০৭৫-১০৯৪
২৮	আল মুস্তাজহির বিন আল	৪৮৭-৫১২	১০৯৪-

	মুক্তাদি		১১১৮
২৯	আল মুস্তারশিদ বিন আল মুস্তাজহির	৫১২-৫২৯	১১১৮-১১৩৪/৩৫
৩০	আর রশীদ বিন আল মুস্তারশিদ	৫২৯-৫৩০	১১৩৪/৩৫-১১৩৫/৩৬
৩১	আল মুকতাফি বিন আল মুস্তাজহির	৫৩০-৫৫৫	১১৩৫/৩৬-১১৬০
৩২	আল মুসতানযিদ বিন আল মুকতাফি	৫৫৫-৫৬৫	১১৬০-১১৭০
৩৩	আল মুসতাযী' বিন আল মুসতানযিদ	৫৬৫-৫৭৫	১১৭০-১১৮০
৩৪	আন নাসির বিন আল মুসতাযী'	৫৭৫-৬২২	১১৮০-১২২৫
৩৫	আজ জাহির বিন আন নাসির	৬২২-৬২৩	১২২৫-১২২৬
৩৬	আল মুস্তানসির বিন আল জাহির	৬২৩-৬৪০	১২২৬-১২৪২
৩৭	আল মুসতা'সিম বিন আল মুস্তানসির	৬৪০-৬৫৬	১২৪২-১২৫৮

ওসমানীয় তুর্কী শাসনামল (১২৯৯-১৯২৪ খৃঃ = ৬২৫ বছর)

	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	ওসমান বিন আরতুঘরীল	৬৯৯-৭২৬	১২৯৯-১৩২৬
২	অরখান গাজী বিন ওসমান	৭২৬-৭৬১	১৩২৬-১৩৫৯
৩	মুরাদ (১ম) বিন অরখান	৭৬১-৭৯২	১৩৫৯-১৩৮৯
৪	বায়েযীদ (১ম) বিন মুরাদ (১ম)	৭৯২-৮০৫	১৩৮৯-১৪০২
৫	মুহাম্মাদ (১ম) বিন বায়েযীদ (১ম)	৮০৫-৮২৪	১৪০২-১৪২১
৬	মুরাদ (২য়) বিন মুহাম্মাদ (১ম)	৮২৪-৮৪৮	১৪২১-১৪৪৪
৭	মুহাম্মাদ (২য়) আল ফাতেহ বিন মুরাদ (২য়)	৮৪৮-৮৫০	১৪৪৪-১৪৪৬
-	মুরাদ (২য়) বিন মুহাম্মাদ **	৮৫০-৮৫৫	১৪৪৬-১৪৫১
-	মুহাম্মাদ (২য়) আল ফাতেহ বিন মুরাদ (২য়) **	৮৫৫-৮৮৬	১৪৫১-১৪৮১
৮	বায়েযীদ (২য়)বিন মুহাম্মাদ (২য়)	৮৮৬-৯১৮	১৪৮১-১৫১২
৯	সেলিম (১ম)বিন বায়েযীদ (২য়)	৯১৮-৯২৬	১৫১২-১৫২০
১০	সুলাইমান বিন সেলিম (১ম)	৯২৬-৯৭৩	১৫২০-১৫৬৬
১১	সেলিম (২য়) বিন সুলাইমান	৯৭৩-৯৮২	১৫৬৬-১৫৭৪
১২	মুরাদ (৩য়) বিন সেলিম (২য়)	৯৮২-১০০৩	১৫৭৪-১৫৯৫
১৩	মুহাম্মাদ (৩য়) বিন মুরাদ (৩য়)	১০০৩-১০১২	১৫৯৫-১৬০৩
১৪	আহমাদ (১ম) বিন মুহাম্মাদ (৩য়)	১০১২-১০২৬	১৬০৩-১৬১৭
১৫	মুসতফা (১ম) বিন মুহাম্মাদ (৩য়)	১০২৬-১০২৭	১৬১৭-১৬১৮
১৬	ওসমান (২য়) বিন আহমাদ (১ম)	১০২৭-১০৩১	১৬১৮-১৬২২
-	মুসতফা (১ম) বিন মুহাম্মাদ (৩য়)**	১০৩১-১০৩২	১৬২২-১৬২৩
১৭	মুরাদ (৪র্থ) বিন ওসমান (২য়)	১০৩২-১০৪৯	১৬২৩-১৬৪০
১৮	ইবরাহীম (১ম) বিন ওসমান (২য়)	১০৪৯-১০৫৮	১৬৪০-১৬৪৮
১৯	মুহাম্মাদ (৪র্থ) বিন ইবরাহীম (১ম)	১০৫৮-১০৯৮	১৬৪৮-১৬৮৭
২০	সুলাইমান (২য়) বিন ইবরাহীম(১ম)	১০৯৮-১১০২	১৬৮৭-১৬৯১
২১	আহমাদ (২য়) বিন সুলাইমান (২য়)	১১০২-১১০৬	১৬৯১-১৬৯৫
২২	মুসতফা (২য়) বিন আহমাদ (৪র্থ)	১১০৬-১১১৫	১৬৯৫-১৭০৩
২৩	আহমাদ (৩য়) বিন আহমাদ (৪র্থ)	১১১৫-১১৪৩	১৭০৩-১৭৩০
২৪	মাহমুদ (১ম) বিন মুসতফা (২য়)	১১৪৩-১১৬৭	১৭৩০-১৭৫৪
২৫	ওসমান (৩য়) বিন মাহমুদ (১ম)	১১৬৭-১১৭১	১৭৫৪-১৭৫৭
২৬	মুসতফা (৩য়) বিন মাহমুদ (১ম)	১১৭১-১১৮৭	১৭৫৭-১৭৭৩
২৭	আব্দুল হামীদ (১ম) বিন মোসতফা (৩য়)	১১৮৭-১২০৩	১৭৭৩-১৭৮৯
২৮	সেলিম (৩য়) বিন আব্দুল হামীদ(১ম)	১২০৩-১২২২	১৭৮৯-১৮০৭
২৯	মুসতফা (৪র্থ) বিন আব্দুল হামীদ(১ম)	১২২২-১২২৩	১৮০৭-১৮০৮
৩০	মাহমুদ (২য়) বিন আব্দুল হামীদ (১ম)	১২২৩-১২৫৫	১৮০৮-১৮৩৯
৩১	আব্দুল মাজীদ বিন মাহমুদ (২য়)	১২৫৫-১২৭৮	১৮৩৯-১৮৬১
৩২	আব্দুল আজীজ বিন মাহমুদ (২য়)	১২৭৮-১২৯৩	১৮৬১-১৮৭৬
৩৩	মুরাদ (৩য়) বিন আব্দুল মাজীদ	১২৯৩	১৮৭৬-১৮৭৬
৩৪	আব্দুল হামীদ (২য়) বিন আব্দুল মাজীদ	১২৯৩-১৩২৭	১৮৭৬-১৯০৯
৩৫	মুহাম্মাদ (৫ম) বিন আব্দুল মাজীদ	১৩২৭-১৩৩৬	১৯০৯-১৮১৮
৩৬	মুহাম্মাদ (৬ষ্ঠ) বিন আব্দুল মাজীদ	১৩৩৬-১৩৪০	১৯১৮-১৯২২
-	আব্দুল মাজীদ (২য়) বিন আব্দুল আজীজ	১৩৪৩	১৯২২-১৯২৪

* ওসমানীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম খাদেমুল হারামাইন আশ-শরীফাইন ও খলীফাতুল মুসলিমীন উপাধি ধারণ করেন।

** পুনরায় আরোহণ।

আইকিউ

[‘আইকিউ’ বিভাগে প্রদত্ত কুইজ ও শব্দজটের সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ১৫ ফেব্রুয়ারী’১০-এর মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। -বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ

১. আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে ভয় করে কারা?
ক. ধনীগণ খ.দরিদ্রগণ গ. জ্ঞানীগণ ঘ. সৎব্যক্তিগণ

২. মানব জীবনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব কি?
ক. ধনীর সাথে দরীদ্রের দ্বন্দ্ব খ. শিল্পের সাথে শক্তির দ্বন্দ্ব
গ. হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব গ. রাজা ও প্রজার দ্বন্দ্ব

৩. বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা কত?
ক. ৬,৬৭১ মিলিয়ন খ. ৬,৫৫০ মিলিয়ন
গ. ৬,৬১৭ মিলিয়ন ঘ. ৬০০০ মিলিয়ন

৪. বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগে জাহিলিয়াতের আক্রমণ কয়টি কারণে সংঘটিত হয়েছিল?
ক. দু’টি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৫. ইহসানের কাজ কি?
ক. জ্ঞানের নির্দেশনা দেওয়া খ. আত্মার পবিত্রতা সৃষ্টি করা
গ. মানুষকে দয়াবান করা ঘ. অন্যায় থেকে বিরত রাখা

৬. সবচেয়ে বড় গুণাহ কোনটি?
ক. শিরক খ. বিদ‘আত গ. যুলুম ঘ. নিফাক

৭. সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস কে?
ক. আল্লাহ খ. রাষ্ট্রপ্রধান গ. জনগণ ঘ. বিচারক

৮. আহলেহাদীছ কি?
ক. একটি মাযহাব/ মতবাদের নাম খ. একটি সংগঠনের নাম
গ. একটি আন্দোলনের নাম ঘ. একটি সম্প্রদায়ের নাম

৯. ভারত বিভক্তির সময় ‘আমরা প্রথমে মুসলিম তারপর ইন্ডিয়ান’- এ বক্তব্যটি কার ছিল?
ক. মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ঘ. শেরে বাংলা

১০. ভারতবর্ষে ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের সূচনা হয় কখন?
ক. ৭১২ খৃঃ খ. ১০০০ খৃঃ গ. ১১৯২ খৃঃ ঘ. ১২০৪ খৃঃ

১১. বাংলা মুসলিম শাসনাধীন ছিল কত বছর?
ক. ৫০০ বছর খ. ৫৫০ বছর গ. ৫৫৪ বছর ঘ. ৫৬০ বছর

১২. বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মের সংখ্যা আনুমানিক কত?
ক. ২৫০০টি খ. ৪৫৭৫টি। গ. ৪২০০টি ঘ. ৪০০০টি

১৩. ওসমানীয় তুর্কী শাসনামল কত বছর অব্যাহত ছিল?
ক. ৬৫০ বছর খ. ৬১০ বছর গ. ৬২৫ বছর ঘ. ৬৩৫ বছর

১৪. সর্বশেষ ওসমানীয় খলীফার নাম কি?
ক. আব্দুল মাজীদ খ. আব্দুল আজীজ
গ. আব্দুল হামীদ ঘ. মুরাদ

১৫. মানবজগৎ পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ কি?
ক. আক্বীদা বা বিশ্বাস পরিশুদ্ধ না থাকা। খ. দুনিয়াবী জীবনের প্রতি আকর্ষণ। গ. আখিরাতকে ভুলে যাওয়া। ঘ. অহংকারী হওয়া।

১৬. দ্বীনের প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয় কোনটি?
ক. পরিশুদ্ধ আক্বীদা খ. ছালাত কায়েম
গ. ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা ঘ. সৎ চরিত্রবান হওয়া

১৭. প্রথম আরবী অভিধানের নাম কি?
ক. কিতাবুল আইন খ. লিসানুল আরাব
গ. আল-কামূসুল মুহীত ঘ. আছ-ছিহাহ

১৮. ইসরাঈল ফিলিস্তিনের বুকে সর্বাধিক বর্বরোচিত হামলা চালায় কবে?
ক. ১৯৬৭ সালে খ. ১৯৮১ সালে
গ. ১৯৯২ সালে ঘ. ২০০৮ সালে

১৯. পাকিস্তানের বর্তমান গোলযোগপূর্ণ স্থান কোনটি?
ক. সোয়াত খ. বুনার গ. বেলুচিস্তান ঘ. ওয়াজিরিস্তান

২০. ‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যগ্রন্থটির লেখক কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. গোলাম মোস্তফা
গ. ইসমাঈল হোসেন সিরাজী ঘ. ফররুখ আহমদ

(উত্তরের জন্য বর্তমান সংখ্যাটি দেখুন)

শব্দজট

১		২	■	৯		
■	■	৩			■	■
■	■		■		■	■
৪			■	১০		১১
	■	■	■	■	■	
৫		৬	■	১২		
■	■		■		■	■
■	■	৭			■	■
৮			■	১৩		

পাশাপাশি :
১. ঈমানের প্রথম শর্ত ৩. অধিকার গ্রহণ ৪. ধাতব মুদ্রা ৫. চোখ, অক্ষি ৭. পশুচারণকারী ৮. বৃষ্টি ৯. লেখনীর উপকরণ ১০. বর্শাবিশেষ ১২. কুরআনের একটি সূরা ১৩. যা স্থায়ী নয়, ধ্বংসশীল

উপর-নীচ :
২. ধর্মীয় শিক্ষাগার ৪. বিনষ্ট ৬. সৌদি আরবের একটি শহর ৯. পাখির কূজন, ১১. পূর্বকালে ব্যবহৃত পানির পাত্র ১২. জাগরণ